প্রথম প্রকাশ ১৭৯৭ শক : ১৮৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩০৩ : ১৮৯৬
তৃতীয় নবতম সংস্করণ : ১৯১৪

প্রাপ্তিস্থান
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

বানান্‌ বিষয়ক গোটাদ্ুই মন্তব্য

অন্ত্য-ওকার যেখানে ইও'র অপভ্রংশ, সেখানে ওকারের পরিবর্তে যফলা-ওকার বসানো হইয়াছে; তথৈব, অন্ত্য একার যেখানে ইএ'র অপভ্রংশ, সেখানে একারের পরিবর্তে যফলা-একার বসানো হইয়াছে; যথা—

থেকো (কিনা থাকিও)—ইহার স্থানে "থেক্যো" বসানো হইয়াছে।

বোকো না (কিনা বকিও না)—ইহার স্থানে "বোক্যো না" বসানো হইয়াছে।

এসে (অর্থাৎ আসিএ)—ইহার স্থানে "এস্যে" বসানো হইয়াছে।

হোয়ে (অর্থাৎ হইয়ে)—ইহার স্থানে "হয়্যে" বসানো হইয়াছে।

যে-যে স্থলে "এক-ই" এই শব্দ "একৈ" এইর্‌পে উচ্চারিত না হইলে ছন্দঃপতন অনিবার্য, সেই সেই স্থলে উক্ত শব্দ (অর্থাৎ "এক-ই" এই শব্দ) "একৈ" এইর্‌পে লিখিত হইয়াছে।

এইর্‌প আরও কয়েকটি ভাষাতত্ত্বের বিধানান্‌যায়ী বানানের অবতারণা করা হইয়াছে। সকল ভাষাতেই সময়ে সময়ে উচ্চারণের সহিত যোগ রাখিবার জন্য এইর্‌প বানানের পরিবর্তন ঘটানো হইয়া থাকে; তা বই, ইহা ন্‌তন কিছ্ুই নহে।

স্বপ্ন-প্রয়াণ

প্রথম সর্গ

মনোরাজ্য-প্রয়াণ

সূচনা

স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেক দিনের পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥ ১॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল
করে দুল-দুল
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি'॥ ২॥

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে॥ ৩॥

অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্যে ফাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা॥৪॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনো-মন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে-দেখিতে
অমনি চকিতে
এ'ল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি'॥ ৫॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়্যে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হয়্যে কল্পনা-কুমারী॥ ৬॥

দেখিতে না-দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্বাণ॥ ৭॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয়;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছু কাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয়॥ ৮॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য!
নাহি দিক্‌বিদিক্! অগম শূন্য! হেথায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা,
এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন॥" ৯॥

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি',
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য করি'!
কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি'-রয় সকল পাসরি'॥ ১০॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিত-চ্ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু
পড়ি'-রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা॥ ১১॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্তে সে সব!
জাগি'-উঠে ভয়
"স্বপ্ন এ ত নয়?"
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব॥ ১২॥

"সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী॥ ১৩॥

"কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব!
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়! ১৪॥

"বেড়া'তাম কত খুসিতে-হাসিতে!
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম
কলপনা নাম,
নব নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে! ১৫॥

"এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়ো আসিয়াছ, সারথির ধরিয়া আকার!
অশ্ব, তেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা!
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ১৬॥

"যাইতেছ কোথায়, বল ত শুনি!"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্য-মুখে কহিল তরুণী।
শুনি, মনোরাজ্য
হয়ে অনিবার্য,
"লয়ে চল লয়ে চল" বলি'-উঠে গুণী॥ ১৭॥

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব-অপসরা!
দলি' স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু!
কল্পতরু-ছায়া-তলে রঙ্গে হাসে ধরা॥ ১৮॥

"তোমাসঙ্গে তথায় না যা'ব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি।
অই মম তপ,
অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি॥" ১৯॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি', হরি-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে
লোল-দিল রাসে;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ॥ ২০॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন,
হর্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা-করে দিগন্তের পট॥ ২১॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত তনু।
ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু॥ ২২॥

থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী,
কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে॥ ২৩॥

"রম্য এ যে উপবন!"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক-পানে।
"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি',
সমীরে হেলি-দুলি',
করিছে কোলা-কুলি,
অভেদ প্রাণে॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায়;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক,
নয়ন অনিমিক
ফিরান' দায়॥" ২৪॥

দ্বিতীয় সর্গ

নন্দনপুর-প্রয়াণ

সূচনা

কবির বাল্যকালের আনন্দ-নিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম সঙ্গীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত—পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ পরিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরন্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্য-রসাস্বাদন-শক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব—মাধুর্য-গুণ। শরন্ময়ী কিনা শারদীয় ভাব—প্রসাদ-গুণ।

"আশ্চর্য এ দেশ" কহে কবিবর
"কোথায় আনিলে তুমি আমায়! কি দিব্য সরোবর
শোভিছে অদূরে!
কোন্ সুরপুরে
এ'লাম না জানি, ধরি' মর্ত্ত্য-কলেবর॥ ১॥

"আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির!"
কহিল কল্পনা
"এসেছ অল্প না—
কেমন দেখিছ এই সরোবর-তীর? ২॥

"দু-দণ্ড জিরাও বসি এই ঠাঁই।
আমি গিয়া আতিথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই।
সঙ্গী এক জন
আসিবে এখন,
বলিও-কহিও তারে যখন যা' চাই॥ ৩॥

ধর' এই ফুল-মালা, নব-যাত্রি;
মায়া-দেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-অধিষ্ঠাত্রী।"
বলিয়া অমনি
নাহি সে রমণী!
অন্ধকারে ডুবিল গো পূর্ণিমা রাত্রি॥ ৪॥

"হায়! হায়! কলপনা গেল চলি'!
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি!
কেন আর মিছে
সমীর বহিছে!
কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি!" ৫॥

স্বপ্নাবেশে পাইয়া বিপুল ধন,
জাগে যথা দীন-দুঃখী মণি-হারা ফণীর মতন,
কবির সহসা
হ'ল সেই দশা;
স্বর্গ-হ'তে রসাতলে দারুণ পতন! ৬॥

হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস;
করে কুসুমের গুচ্ছ, মুখে হাসি, নবীন বয়স।
না জানি, যুবক,
কি জানে কুহক,
করিল কবির মন মুহূর্তেকে বশ॥ ৭॥

সখ্য-রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া, সংসর্গ যাচে।
সখ্য মৃদু হাসি'
কুশল জিজ্ঞাসি',
ঢালিল মধুর বাণী সুললিত ছাঁচে॥ ৮॥

"কবিত্ব যে, কি বিত্ত, জানি তা' আমি;
যশের সৌরভ-বশে আসিয়াছি, কাব্য-রস-কামী।
যেইরূপ অলি,
মধু-কুতূহলী,
কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামী॥" ৯॥

কবি কহে "তব আগমনে আজ
কবিত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব ঋতুরাজ।
তব সু-পবনে
কাব্য-উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ॥ ১০॥

"কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস,
কুশল বারতা কহি' পূরাও মনের অভিলাষ।
কোথা হ'তে আসা,
কোন্ ঠাঁই বাসা?
না শুনিলে বিবরণ নাহি মিটে আশ॥" ১১॥

হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস,
"পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,—
উঠাইলে গল্পে,
ফুরা'বে না অল্পে,
দীনের কুটীরে হো'ক্ চরণ-পরশ॥" ১২॥

"এই ঠাঁই আছি ভাল" কহে কবি।
সখ্য বলে "জাগিয়া উঠিল যেই মলয় সুরভি—
কি কষ্টের লাগি'
নিশ্বাস তেয়াগি'
শীহরিলে? মুখে কেন বিষাদের ছবি॥" ১৩॥

"পষ্ট কোন কষ্ট নাই" কহে কবি,
"যাতায়াতে অমন হইয়া-থাকে ম্লান মুখচ্ছবি;
সকলেরি হয়,
মোর শুধু নয়!"
এত বলি' নিশ্বাসিল শান্তি নাহি লভি'॥ ১৪॥

ডাকে সখ্য "কোথায় গো দাস্য-রস;"
ভৃত্য এক আইল মুহূর্ত্ত মাঝে, না করি' আলস।
বস্ত্র বিছাইয়া,
দ্রব্য গুছাইয়া,
হস্ত দুই করি'-লয় স্বাধীন স্ববশ॥ ১৫॥

ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল,
সুবাসিত, সুরঞ্জিত, পরাইল বস্ত্র নিরমল।
তুলিয়া চম্পক,
রচিয়া স্তবক,
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হ'ল পরাণ বিকল॥ ১৬॥

ফল-মূল মিষ্টান্ন, সায়াহ্ন কালে,
নিবেদিল কবিবরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে।
পাতিল তখন
রাঙ্কব-আসন,
মরকত মণিময় ঘাটের চাতালে॥ ১৭॥

যেমন বসিল কবি সুখাসনে,
অমনি ঘুচিল ক্লম, পথশ্রম না রহিল মনে।
ইহা করি' লক্ষ,
সুখী হয়ে সখ্য,
বিবরিয়া বলে সব পথিক-সুজনে॥ ১৮॥

"সজ্জন-সেবায় আমি নিরলস,
গন্ধর্ব, নিবাস বিলাস-পুর, নাম সখ্য-রস।
নন্দনের পতি
আনন্দ-ভূপতি,
তাঁরি আজ্ঞাকারী আমি রজনী-দিবস॥ ১৯॥

"মায়া-নামে আছেন বন-দেবতা,
রাণী তিনি আনন্দ-নরপতির, সতী পতিব্রতা।
কল্পনা-কুমারী,
কন্যা হ'ন তাঁ'রি;
পাইনু তাঁহারি কাছে তোমার বারতা॥ ২০॥

"জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপের, প্রমোদ নাম,
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি' নিজ ধাম।
প্রমোদ-যুবক
মাতার সেবক,
কিন্তু জনকের প্রতি কিছু যেন বাম॥ ২১॥

"মায়া তা'রে দিলেন বিলাস-পুর,
স্নেহের হইয়া বশ; আমোদেই যুবা ভরপুরে
সেই সে অবধি;
সুখের জলধি
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর! ২২ ॥

"এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
এ'র নাম মানস; নন্দন-পুর যেমন সুন্দর,
মানস সরসী
তেমনি আরসী—
কটাক্ষে নিখিল হয় নয়ন-গোচর ॥ ২৩ ॥

"ত্রিদিব হইতে নাবি' মন্দাকিনী
মিলিয়াছে এ-দিকে; ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনী
ভোগবতী নদী;
বলি সব যদি,
রাত্রি অবসান হ'বে, এত সে কাহিনী ॥ ২৪ ॥

"তরঙ্গিণী-দোঁহার সঙ্গম-মুখে
ওই শোভে বিলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে।
অনিল-হিল্লোলে,
বৃক্ষটি না দোলে,
আরামে ঘুমায় যেন দিগন্তের বুকে ॥" ২৫ ॥

কথা-বার্তা চলিতেছে অবিরাম;
হেনকালে আইল গন্ধর্ব এক, সুদর্শন নাম;
চড়ি' পুষ্পরথে,
এ'ল শূন্য-পথে;
আনন্দ-রাজার দূত নেত্র-অভিরাম ॥ ২৬ ॥

নামিয়া অভিবাদিয়া সমাদরে,
বলিল সে "স্মরিয়াছে নরপতি কবি-গুণধরে;"
সখ্য বলে "আমি
হই অনুগামী;"
উড়িয়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥ ২৭ ॥

দিব্য এক বনোদ্যান-পরিসর—
মধ্যে এক অট্টালিকা! এই ঠাঁই গন্ধর্ব-বর
থামাইয়া রথ,
দেখাইয়া পথ,
আগে আগে চলিল, বলিল তার পর॥ ২৮ ॥

"শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী।
রাজ-অট্টালিকা তার, দেখ এই, শত-দ্বারবতী।
মনো-দেবতার
যত অবতার,
নিরখ' তাঁদের এই সাধের বসতি॥" ২৯ ॥

সভায় পশিয়া পুলকিতচ্ছবি
দুয়ারের সন্নিধানে করযোড়ে দাঁড়াইল কবি।
নিরখিয়া নৃপে
নয়ন না তৃপে—
উদয়-শিখরে যেন বিরাজিছে রবি॥ ৩০ ॥

নন্দনের ভূপতি আনন্দে গলি,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে "এ'স বৎস" বলি।
প্রণমিয়া কবি
পদধূলি লভি'
"ধন্য হইলাম" বলে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥ ৩১ ॥

সযতনে বসাইয়া কবিবরে
বলে ভূপ "শূন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত দিন পরে।
সেই তুমি কবি
ফিরিতে অটবী,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্তের তরে॥ ৩২ ॥

ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর!"
চারিদিক্ নিরখিয়া ধীরে ধীরে কহে কবিবর,
"যেই কোন ঠাঁই,
নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর॥ ৩৩ ॥

"আবাস এ-যে আমার বারো-মেসে!
প্রথমে হইল মনে 'কোথায় পড়িনু আমি এস্যে?'
পদে পেয়ে কূল
ভাঙি' গেল ভুল—
বিদেশ হইতে যেন আইনু স্বদেশে॥" ৩৪॥

প্রমোদের ছোট' দুই সহোদরে
নিরখিল কবিবর; হরষ-উল্লাস নাম ধরে
যমক সে-দুটি;
আঁখি ফুট্‌ফুটি'
হাসিতে লাগিল হেরি' কবি-সুধাকরে॥ ৩৫॥

মৈত্র বলে "অমন করিতে নাই;"
হাসি' বলে অনুরাগ "সমান চঞ্চল দুই ভাই!"
বলিল বাৎসল্য
"বালক-চাপল্য
বালকে না যদি র'বে, র'বে কোন্ ঠাঁই?" ৩৬॥

স্বাস্থ্য বলে "চাপল্যে সাফল্য আছে;
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে কি তা' ক্ষুদ্র চারা-গাছে?
বালক-রুধির
হয় কভু ধীর?
অর্থ-হীন কার্য নাই প্রকৃতির কাছে॥" ৩৭॥

দাক্ষ্য বলে "চাপল্য যেমন চাই,
শিক্ষা চাই তা'র সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই।"
বলিল কৌশল,
"দুয়ের মিশল
কেমনে ঘটিতে পারে ভাবিতেছি তাই॥ ৩৮॥

"আগে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা,
তা'র পর শিক্ষা-দান; এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান—
চাই অবধান;
দুধে না পড়ে গো যেন অম্ল-রস-কণা॥" ৩৯॥

বলিলেন ভূপতি বালক-দ্বয়ে,
"ঘরে যাও এখন;" চলিল দোঁহে ভিতর-আলয়ে।
বাৎসল্যের প্রতি
চাহি' নরপতি,
বলিলেন "কি ভাবিলে প্রমোদ-বিষয়ে॥ ৪০॥

"সভাসদ সবে আজি উপস্থিত,
খুলি'-বল' নিজ-নিজ অভিপ্রায় বাছি' হিতাহিত।
যা' বলিবে তা'র
মন্থি' ল'ব সার,
বিবেচিয়া তা'র পর করিব বিহিত॥" ৪১॥

বাৎসল্য বলিল তবে "নরপতি,
বিশেষ একটু বিবেচনা চাই প্রমোদের প্রতি।
বয়স যেরূপ
তা'রি অনুরূপ
আচরণ হইয়াছে তাহার সম্প্রতি॥ ৪২॥

"যৌবনের বাতাস লাগিলে গায়,
মনো-অশ্ব উদ্দাম হইয়া উঠি' ঊর্ধ্ব-মুখে ধায়।
কে তখন তা'রে,
ফিরাইতে পারে?
ঠেকিয়া, আপনি ফিরে, পথের বাধায়॥ ৪৩॥

"অপরাধী সে জন মানিনু আমি,
কিন্তু দূত পাঠাইল সে যখন অনুগ্রহ-কামী,
তখন কি তা'রে,
অকূল পাথারে
ফেলি' রাখা উচিত, নন্দনপুর-স্বামি?" ৪৪॥

নিবেদিল কৌশল "বল্যেছ ঠিক;
কিন্তু বিবেচনা চাই,—প্রিয় যা'র বিলাসের দিক্,
বিনা-প্রলোভনে
নন্দন-ভবনে
তিষ্ঠিয়া-থাকিতে নারে ক্ষণের অধিক॥ ৪৫॥

"সংযম যাহার নাহিক সাধা,
শ্রেয়'-পথে ফিরিতে আপনি হয় আপনার বাধা।
ছাড়া পে'লে অশ্ব,
ছুটিবে অবশ্য;
ভক্ষ্য দেখাইয়া এবে, তা'রে চাই বাঁধা॥ ৪৬॥

"যৌবরাজ্য প্রলোভন উপাদেয়;
তা'ই তা'রে অনুমতি কর' ভূপ; তনয়ে অদেয়
কি আছে পিতার?
পে'লে রাজ্য-ভার
অবশ্য বাছিতে হ'বে শ্রেয় আর প্রেয়॥" ৪৭॥

মৈত্র বলে "যদিও বিলাস-পুর
চির-বসন্তের বাস, পাতাল নহেক বড় দূর
সে স্থান-হইতে;
দানব-সাহতে
সতত সংগ্রাম বাঁধে দারুণ নিষ্ঠুর॥ ৪৮॥

"দূত-মুখে প্রমোদ কহিছে এই,
'অন্বেষিয়া জানিলাম শত্রু মোর সকল দিকেই;
যদি মোর প্রাণ
বাঁচাইতে চা'ন,
সহায় পাঠা'ন পিতা এই মুহূর্তেই॥' ৪৯॥

"সহায়-প্রেরণে হো'ক্ অনুমতি
নহিলে যা' দেখিতেছি-শুনিতেছি ভাল নহে গতি।
শাসাইছে তা'রে,
দর্প-সহকারে,
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-পতি॥" ৫০॥

অনুরাগ বলিল "বিলম্ব করা
ভাল না দেখায় আর; শুভ কাজে সাজে ভাল ত্বরা।
অক্ষৌহিণী-দশ
লয়ে বীর-রস,
নাশুক্ দানব-দর্প, শান্ত হো'ক্ ধরা॥ ৫১॥

বীর-সঙ্গে সমরে পশিব আমি;"
সভাস্থ সকলে বলে "মোরা-সবে হ'ব অনুগামী;
কর' এইবার
প্রমোদে উদ্ধার;
যুবা সে আপনি নয় আপনার স্বামী॥" ৫২॥

দাক্ষ্য বলে "যৌবরাজ্যে অভিষেক
কর' তা'রে ভূপতি, সময় যেন না পায় তিলেক
করিতে বিশ্রাম;
চারি চারি যাম,
কর্ম্ম-গাছে করে যেন ঘর্ম্ম-জল-সেক॥" ৫৩॥

স্বাস্থ্য বলে "কাজের সময় কাজ,
বিশ্রামের সময় বিশ্রাম চাই; একরূপ সাজ
সাজে না নিয়ত;
আপনার মত
আপনিই চলিবেন, হ'লে যুবরাজ॥" ৫৪॥

সমাপিলে মন্ত্রণা বলিল ভূপ
"শুনিলাম তোমাদের অভিপ্রায় যাহার যেরূপ।
সকলি সুযুক্তি,
সকলি সদুক্তি,
এতক্ষণ ছিনু তাই শ্রবণ-লোলুপ॥ ৫৫॥

"কর্ত্তব্য আমার এই মনে লয়,
সখ্য যাও তা'র কাছে, মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না হয়।
গিয়া তুমি তথা,
বল' এই কথা,
'সহায় আসিছে তব, দূর কর' ভয়॥ ৫৬॥

" 'দৈত্য-গণে সংগ্রামে করিয়া জয়,
বীরে দিয়া রাজ্য-ভার, ফিরি'-চল' নন্দন-আলয়।
নন্দন-নগরে
আনন্দ বিহরে,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ-ভয়॥' ৫৭॥

" 'নন্দনের গিরি-চূড়া অভ্র-লিহা,
নন্দনের কানন লক্ষ্মীর বাস,' বল' তারে ইহা।
'নন্দনের বায়
লাগে যদি গায়,
রসাতল-মগ্ন হ'বে বিলাসের স্পৃহা॥' ৫৮॥

"যৌবরাজ্যে করি তা'রে অভিষেক,
শান্তি-ধামে যা'ব আমি, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক।
হেন বুঝাইয়া
আন' ফিরাইয়া,
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক॥ ৫৯॥

"এই পত্র সঁপিবে তাহার হাতে;
বলিবার যা' আমার, বলিলাম সমস্ত ইহাতে।
যাও হে ত্বরিতে;
বিলাস-পুরীতে
দিবা হয় রজনীতে, নিশা হয় প্রাতে॥" ৬০॥

সখ্য বলে "পাইলে আদেশ-বাণী,
মুহূর্ত্ত-কালের তরে বিলম্বিতে কভু নাহি জানি।
দিব্য এ সময়;—
আজ্ঞা যদি হয়,
কবিরে বিলাস-পুর দেখাইয়া আনি॥" ৬১॥

নৃপ কহে "উত্তম; সরস লোক
দেখুন সরস দৃশ্য, ক্রমে-ক্রমে খুলি' যা'বে চোক।
ত্রিজগতে নাই
হেন কোন ঠাঁই,
মনোরাজ্যে নাহি যা'র ভাবের আলোক॥ ৬২॥

"কবি তুমি, তোমারে বারণ নাই—
বেড়াও যেখানে হয় অভিরুচি, তোমারি এ ঠাঁই!
ওহে চিত্ররথ,
শীঘ্র আনো রথ,
কবিবরে কিছু আমি দেখাই শুনাই॥ ৬৩॥

"তা'র পরে যা'বেন সখ্যের সনে।"
চিত্ররথ আনিল পুষ্পক-রথ সাজায়ে যতনে।
নৃপের পশ্চাতে
আরোহিয়া তা'তে,
চলিল সভাস্থ-সবে প্রফুল্ল-বদনে॥ ৬৪॥

হেতায় সরিৎ-সিন্ধু, হোতা গিরি,
হেতা তৃণ-ময় ভূমি, চৌদিকে বনান্ত আছে ঘিরি'।
মধ্যে এক হর্ম্য
বিরাজে সুরম্য,
দেব-রথ তথায় পশিল ধীরি ধীরি॥ ৬৫॥

শোভা-নামে নৃপ-কন্যা এই ঠাঁই
বিহরেন সজনী-জনের সনে; ভাসেন সদাই
রূপের তরঙ্গে;
এবে সখি-সঙ্গে
গিয়াছেন বন-ভূমে, অদর্শন তাই॥ ৬৬॥

চিত্রলেখা নামে এক সহচরী
রথ-শব্দে চমকিয়া, নামি'-এ'ল কার্য পরিহরি';
গমনে মন্থরা,
তবু করি' ত্বরা,
দ্বার-পাশে দাঁড়াইল কর-যোড় করি'॥ ৬৭॥

"পবিত্র হইল ঘর" এত বলি',
প্রণমিল বালা নরপতি-পদে ভক্তিরসে গলি'।
যথাবিধি আর
করিয়া সৎকার
দাঁড়াইল পার্শ্বে পুন হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥ ৬৮॥

নৃপ কহে "কবি
দেখিবেন ছবি"
এত শুনি চিত্রলেখা মনোমাঝে হর্ষ অনুভবি
বলিল "আমার
সৌভাগ্য অপার—
রচনা নিরখিবেন কবিকুলরবি॥ ৬৯॥

"নরপতি দেবের প্রসাদ-নীরে
তুলি করি মন্ত্রপূত রচিয়াছি আমি ধীরে ধীরে
এই সব ছবি!"
হেরি' কহে কবি
"বন্দি হ'তে যায় সাধ এ তব মন্দিরে" ॥ ৭০ ॥

চিত্র বলে "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা
বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ-হ'তে ভাব-সুধা আনি' ॥ ৭১ ॥

"গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি';
চক্ চক্ করিছে অরুণ-আভা তদুপরি খসি';
হংস-হংসী তায়,
ভাসি' গায়-গায়,
পদ্ম-বনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলাষি' ॥ ৭২ ॥

"হের' এই, সভার সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগে নিবেশিছে মতি।
কালা অভিমান
রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি! ৭৩ ॥

"হের' এই কতগুলা শুম্ভ দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদভুত!'
চণ্ডিকা-তরুণী
হাসিতেছে শুনি';
গর্জ্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমূত ॥ ৭৪ ॥

"হের' এই, খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব; জানকী দেখিছে বসি' পূজার আসনে;
এ আঁখি-কমল
বরষিছে জল;
এ আঁখি মুছিছে বামা বল্কল-বসনে ॥ ৭৫ ॥

"হের' এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া-আসি' চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন।
শিশু ক্রোড়-তরে
আঁকু-বাঁকু করে;
বাৎসল্যে মুদিত-প্রায় রাণীর নয়ন॥ ৭৬॥

"হের' এই, অর্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট্-সুতে বিরক্ত হইয়া;
বালক বেচারা
ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন-পানে আছয়ে চাহিয়া॥ ৭৭॥

"হের' এই, দিব্য তপোবন-দ্বারে,
উর্বশী নাহিছে সরে, অর্জুনের সঙসর্গ-ভুখে।
বিরহ-বিধুর
মূরতি মধুর,
হয়েছে মধুর-তর মনোরথ-সুখে॥ ৭৮॥

"হের' এই, প্রফুল্ল রজনী-মুখে
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা-শিশু মুখ-মেলিবারে।
শকুন্তলা তায়
ভয়ে মৃত-প্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে॥" ৭৯॥

এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব।
বীর বিশ্ব-জয়ী,
মাতা স্নেহ-ময়ী,
সুন্দরী যুবতী যা'র নাহিক সাদৃশ্য॥ ৮০॥

হেন-কালে এমনি মধুর গীত
পশিল কবির কানে, কবিবর অমনি মোহিত।
"কে গায়" বলিয়া,
চায় উতলিয়া,
"আহা আহা আহা" বলি' চেতন-রহিত॥ ৮১॥

গাইতেছে ভগিনী চিত্র-লেখার,
গান্ধর্বী যাহার নাম, পর নহে কবি এ-দোঁহার।
চিত্র কহে "কবি,
অই—গান্ধরবী
গাহিছে; শুনিবে যদি, খুল' এই দ্বার॥" ৮২॥

দ্বার খুলি' দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন যেন ঘুমে,
চৌদিকে বিপিন,
শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণ-ময় ভূমি, খচিত কুসুমে॥ ৮৩॥

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি'-উঠিয়া ধরিতে-যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল,
ছাড়ি' দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা॥ ৮৪॥

চারি-দিকে হইয়াছে জলাশয়;
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়!
প্রবল-হিল্লোলে
পড়ি' তা'র কোলে,
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয়॥ ৮৫॥

কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি',
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
এই ফোয়ারার
ঘিরি' চারি ধার,
বসিয়া-আছয়ে সব নন্দন-রূপসী॥ ৮৬॥

কাঁপিতেছে বনান্তের ডাল-পালা,
পূর্ণিমা নিশীথে; যেমন স্থান তেমনি নিরালা!
শোভা এই ঠাঁই
আছেন সদাই
কখনো সজনী-সনে, কখনো একালা॥ ৮৭॥

লজ্জা-সজ্জা এ দুই সখীর সনে,
বসিয়া-আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে
অরুণ-বরণ
যুগল-চরণ
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে॥ ৮৮॥

মুখ দেখি, মূক হ'ল দিক্‌বধূ—
অনিমেষ হইল তারকা-আঁখি! কুমুদের বঁধু
না নড়ে না চড়ে—
পলক না পড়ে!
মলয়-মারুতচ্ছলে নিশ্বাসিল মধু॥ ৮৯॥

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সনে,
গান্ধরবী গাইছে বাজা'য়ে বীণা মধুর-নিস্বনে।
নন্দন-রূপসী
শুনে সবে বসি',
গীত-রাগে বীত-রাগ বসন-ভূষণে॥ ৯০॥

যতগুলি হরিণ আছিল জাগি'
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি'।
নেত্র কিসলয়
স্থির করি' রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর-সুধা-লাগি॥ ৯১॥

সভাসদ্-সহিতে নন্দন-স্বামী
দেখা-দিল যখন রমণী-গণে, বন-স্থলে নামি';
মগ্ন ছিল সবে
স্বর-সুধার্ণবে,
কুহক ছুটিয়া-গেল গীত গেল থামি'॥ ৯২॥

গীত-ভঙ্গে কুরঙ্গ পলায় ছুটি',
কোকিলের কুহু-কুহু অমনি উঠিল আর ফুটি'।
লজ্জা-সজ্জা সখী,
ভূপেরে নিরখি',
সংকেতিয়া সজনীরে দাঁড়াইল উঠি'॥ ৯৩॥

শোভা উঠি-দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মনে,
স্নেহ-ভরে বলিল তাহারে ভূপ কবিবর সামনে,
"এঁরে তুমি চেন'?"
শোভা বলে "হেন
মনে লয়, খেলিতেন কল্পনার সনে॥" ৯৪॥

নৃপ বলে "লইয়া বেড়াও তুমি
কবিবরে সঙ্গে করি', বন যথা আছয়ে কুসুমি',
গিরি যথা উচ্চ
ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'॥" ৯৫॥

এত বলি' নৃপতি ললিত ছাঁদে,
মৃদু-হাস্য-শীধুময় করিল শোভার মুখ-চাঁদে।
বলি'-উঠে কবি
"ওই না অটবী
মায়া-মা'র! তাই বলি—প্রাণ কেন কাঁদে! ৯৬॥

"দেখিলেই আমায় সে বনেশ্বরী
ডাকিতেন কত স্নেহে, বসা'তেন কত যত্ন করি'!
কল্পনার সঙ্গে
ফুল তুলি' রঙ্গে,
তাঁরে আনি'-দিতাম আঁচল ভরি' ভরি'—॥ ৯৭॥

"কত তিনি শুনা'তেন উপন্যাস!
বাহির না হ'তে শ্রীমুখের বাণী, করিতাম গ্রাস
মনোকর্ণে তাহা!
রাত্রি-দিন, আহা,
এই ঠাঁই ছিল মোর সাধের আবাস! ৯৮॥

"না হেরিয়া সে আমার জননীরে,
নড়িব না হেতা-হ'তে, অচল যদিও পড়ে শিরে!
নিরখিয়া মায়
হইব বিদায়;"
শোভা বলে "মা আছেন গহন-মন্দিরে॥ ৯৯॥

"আইস লইয়া-যাই সাথে করি',
মায়ের সে নিকেতনে; আয় তোরা দুই সহচরী।"
এত বলি' বালা,
পশে বন-শালা;
কি সৌরভ, কিবা ছায়া, কিবা বিভাবরী! ১০০॥

বনে যেই প্রবেশিল তিন সখী,
উসুখুসু করি'-উঠে বিহঙ্গম, আলোক নিরখি'।
মনে ভাবি "রাত
হ'ল বা প্রভাত"—
ডাকে ক্ষান্ত দিল মুহু, চখা আর চখী! ১০১॥

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ-গতি
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গে ঘেরি-পরাইল পল্লব-দুকূল॥ ১০২॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস॥
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
"এ নহে সে" বলি' শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ ১০৩॥

মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কূজিতে লাগিল পিক বসিয়া শাখীতে॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে।
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন-গভীরে॥ ১০৪॥

শোভা কহে "সুখরাজ্য এই মোর!
ধীরি ধীরি বনে ফিরি, শশী যবে লোভায় চকোর।
হেলি' বট-মূলে
বসি নদীকূলে,
উদয়-শিখরে উঠি' নিশি করি ভোর॥ ১০৫॥

"সরোবরে অই যে কমল-বন,
হোতা যা'ব একাকিনী, উষা যবে মেলিবে নয়ন।
আরো রাত্রি হ'লে,
কুমুদের কোলে
জ্যোছনা বিছানা পাতি' করিব শয়ন॥" ১০৬॥

সজ্জা বলে "দখিনে-বাতাস পেয়ে
ফুল ফুটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়ে—
কবে পিকবর
আনে সু-খবর;
আজি লো নিকুঞ্জ-বন ফেলিয়াছে ছেয়ে!" ১০৭॥

লজ্জা বলে "হৃদয়ে পাইয়া পথ,
ফুলে ভুলাইতে, অলি, কত দেখ করিছে শপথ।
ফুলের মঞ্জরী
মুখ হেঁট করি',
সউরভ নিশ্বাসিয়া কহে মনোরথ॥" ১০৮॥

সজ্জা বলে "ও তোর বচন শুনি'
কথা এক মনে প'ল; ভ্রমিতেছি দু-জন তরুণী
সখী আর আমি;
অমনি লো থামি'
দাঁড়াইনু! নিরখিনু দেব-তুল্য মুনি! ১০৯॥

"বসি'-আছে নয়ন মুদিত করি'!
যাইতেও নারি, ফিরিতেও নারি, তরাসেই মরি!
মুনির নন্দন
আইল তখন,
বলিল 'আশ্রমে এ'স শঙ্কা পরিহরি''॥ ১১০॥

"তা'র সনে হ'ল যেই চোখোচখী,
সেই যে রহিল মুখ হেঁট করি' আমাদের সখী,
একবারটি লো
মুখ না তুলিল!
মরমে পশিল বাণ নয়নে নিরখি'!" ১১১॥

লজ্জা বলে "কি হ'ল তাহার পরে?"
সজ্জা বলে "মুনিপত্নী আমা-দোঁহে সে দিনের তরে
যতন করিয়া
রাখিল ধরিয়া;
প্রত্যূষে বিদায় মাগি' আইলাম ঘরে॥ ১১২॥

"সত্য সে লো তপস্বী মুনির নাম;
শ্রদ্ধা নাম ধরে ঠাকুরাণী সতী, দোঁহারে প্রণাম।
তাপস-নন্দন
তপস্যারি ধন!
কল্যাণ তাহার নাম, পরে জানিলাম॥ ১১৩॥

"পরাণের মালা দিয়া তা'রি গলে
সারা হ'ল সেই-সে অবধি সখী দহি' মনানলে।
তেঁই দিবানিশি
ভ্রমে দিশি দিশি,
শয়ন ভিজায় আর নয়নের জলে॥" ১১৪॥

লজ্জা বলিল "হ'বে
কি লো তবে!
কতদিন পরাণ র'বে,
অমন করি'।
হইয়ে জল-হীন
যথা মীন
থাকিবে ওলো কত দিন
মরমে মরি'!॥

"হৃদয়ে খিল আঁটি',
একলা-টি,
বরণ করিবে কি মাটি,
মাটিতে শুয়ো!
বেদনা-সহচরী
বুকে করি',
পোহাবে কি লো বিভাবরী
কঠিন ভুঁয়ে!" ১১৫॥

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত॥
কখনো চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে॥ ১১৬॥

কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক্, কোথা পিক না জানি ডাকে॥
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান' ঘাস।
শোভা বলিল "এই কাননেই মায়ের বাস॥ ১১৭॥

"হেরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ মিলিবে তাঁর!
বলেন তোমা হীনা 'কবি বিনা ঘর আঁধার॥'
এ সেই মায়াটবী, নাহি কবি, জন মানব।"
পশিল, এত বলি' বনস্থলী; নীরব সব॥ ১১৮॥

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নমনা নামি' নামি', ঊর্ধ্বগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি॥ ১১৯॥

যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাঁই।
ঝিলিলি ছাড়ে বোল, উতরোল, বিরাম নাই॥
হোতায় তালগাছে রহিয়াছে গগন ঢাকা।
আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢুলিছে শাখা॥ ১২০॥

হেতায় ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে॥
কি জানি, কোথা হ'তে, বায়ু-পথে, আসিছে গীত;
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর আচম্বিত॥ ১২১॥

কোথাও নাই কিছু, আগু পিছু সঙ্গীত চরে;
শরীর লোমাঞ্চিত, কথঞ্চিৎ বচন সরে!
সুখে হইয়া দ্রব, যাত্রি-সব, আর না সয়্যে,
তৃণ-বিছান' ভুঁয়ে, পড়ে শুয়্যে, অবশ হয়্যে॥ ১২২॥

যেমন শুয়ো পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত;
করিল, ঘুম ঘোর, রসে ভোর, নয়নপ্রান্ত।
হাসে যেমন ঊষা, অকলুষা, পঙ্কজ-বনে,
নারী-মূরতি এক, হাসিলেক, নিদ্রিত জনে॥ ১২৩॥

যেন অরুণ-আলো, প্রবেশিল, পঙ্কজ-পুটে
যতেক যাত্রি-লোক, মেলি' চোক, জাগিয়া উঠে।
পুলকে নিমগন, যাত্রি-গণ, যা'রে নিরখি',
সাত্ত্বিকা নাম তা'র, মায়া-মা'র প্রধানা সখী॥ ১২৪॥

সুধা বচনে ভাষি', বলে হাসি', মায়ার সখী;
"কত দিনের পরে, কবিবরে, হেতা নিরখি!
এ'স মায়ের ঠাঁই, লয়ে-যাই, জুড়া'বে প্রাণ;
তুমি এস্যেছ যবে, নব হ'বে, এ সব স্থান॥ ১২৫॥

"ফুল ফুট্যেছে গাছে, চেয়ে-আছে, তোমার তরে।
ঐ শুন' আগমনি-পিক-ধ্বনি নিকুঞ্জ-ঘরে॥"
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আগে;
অচল দেখা যায়, ভীমকায়, নিকট-বাগে॥ ১২৬॥

যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শূন্য-পবন
করিয়া আছে সন্ধি, ফুল-গন্ধি বিরাজে বন।
সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হেরিল কবি;
বিরাজে বনেশ্বরী, আলো-করি, মায়া-অটবী॥ ১২৭॥

হেরিলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়,
কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়।
তাঁর সে দুটি পদ-কোকনদ-সুধার আশে
লুটায় ভূমিতলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাষে॥ ১২৮॥

এমনি নিমগন, হ'ল মন, সে রস-পানে,
কেবা কোথায়, কিবা নিশি-দিবা, কিছু না জানে।
স্বরগ করে ভোগ, শোক রোগ সকল ভুলি'।
দেবতা যেন তা'রে ভবপারে, লইল তুলি'॥ ১২৯॥

জানুতে করি' ভর, অতঃপর, (পীযূষ-পানে
হয়্যে শীতল-শান্ত) চায় পান্থ মায়ের পানে।
বিতরি' করচ্ছায়া, বলে মায়া, "আশিস লও,
সকল রোগ শোক দূর হো'ক, অমর হও॥" ১৩০॥

কবি বলিল "দেবি, তোমা সেবি' সব আমার!
কর্য্যেছি পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর?
সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই, আগের মত,
সেই আশিস মাগি, তা'রি লাগি শরণাগত॥" ১৩১॥

নয়ন-সরসিজ মুছি নিজ বারেক দুই
মনে ভাবিল দেবী "সেই কবি এখনো তুই।
করিতে হ'বে কত ঘোর ব্রত উদ্‌যাপন—
বাছা তা জানো নাই, না জানা-ই ভাল এখন॥" ১৩২॥

রাজসী নাম যা'র মায়া মা'র পাগ্‌লী সই
আপন মনে হাসে, কান্না আসে ক্ষণেক বই।
বলে তাহার পরে কবিবরে "আইস উঠি,
কেন তা নাহি ক'ব—দেখি তব নয়ন দুটি!" ১৩৩॥

এত বলি' লইয়া অঞ্জন-শলা
কবির নয়নে মাখাইয়া-দিল কজ্জলের মলা।
সে যে ভাবাঞ্জন
নিখিল-রঞ্জন!
চমৎকার গুণ তা'র নাহি যায় বলা॥ ১৩৪॥

প্রেমের আগুণ, করিয়া দ্বিগুণ,
দূর-বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনিতে নিপুণ।
তৃষ্ণানাশ-কারী
মরীচিকা বারি
পিয়ায় প্রেমিক জনে, এই তার গুণ॥ ১৩৫॥

ভাবাঞ্জনে অপূর্ব নয়ন লভি'
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি।
ভূষিছে, বালিকা,
চারু অট্টালিকা;
সঙ্গে সখী শরন্ময়ী সুরুচি মাধবী॥ ১৩৬॥

দিব্য হর্ম্য-বাতায়ন,
তথায় তিন জন
প্রাণের পরিজন,
লইয়া কাছে;
সমীরণ সুধা ঢালে,
কল্পনা হেন কালে,
হাতটি দিয়া গালে,
বসিয়া আছে।

মাধবী, শরন্মাই,
সুরুচি, তিন সই
জানে না সখী বই
কোন জনায়।
মাধবী শরতে মিলি',
হাসিছে খিলি খিলি,
সুরুচি নিরিবিলি
কেশ বিনায়॥ ১৩৭॥

কুসুম-কাননে যথা,
শোভয়ে পুষ্প-লতা,
লালিত্য চঞ্চলতা
মিলিত করি'।
তাহা করি' অতিক্রম,
সজনী-সমাগম
কি শোভে অনুপম,
আ-মরি-মরি!

ঈষৎ বহিলে বায়,
পুষ্প-লতা হোতায়,
হাসিয়া পড়ে গায়
সবে সবার।
হেতা বায়ু হাস্যালাপ,
অঙ্গ লতা-কলাপ,
স্তনের পরিমাপ
ফুলের ভার॥ ১৩৮ ॥

বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত
হিল্লোল হানে।
কল্পনা সুধীরে উঠি',
ধরি' কপাট-দুটি,
আঁখির দিল ছুটি
বাহির-পানে॥

হেরিল অমনি ধনী,
সুধার যেন খনি,
বিশদ নিশামণি,
কুমুদ-প্রাণ।
জ্যোৎস্না-আঁচল-ধার
খসি' পড়িছে তা'র,
ফাঁকায় অন্ধকার
না পায় ত্রাণ॥ ১৩৯ ॥

লতা-পাতা তাম্র-রুচি,
মালিন্য এবে ঘুচি'
করিছে শুদ্ধ শুচি
রজত-ভান।
ফুল তাহে ধরিয়াছে,
লাবণ্যে ভরি' আছে,
বনেরে করিয়াছে
জীবন-দান!

হেতায় রম্য অটবী,
কোথায় হায় কবি,
জাগিছে তাঁরি ছবি,
কল্পনা-প্রাণে।
নয়নে উদ্যান শোভে,
কোকিল শ্রুতি-লোভে,
হৃদয় কেন ক্ষোভে
হৃদয় জানে ॥ ১৪০ ॥

কোকিল ডাকিল কুহু,
কল্পনা করি' উহু,
নিশ্বাস ফেলে মুহু,
পরাণ কাঁদে।
এ হেন রঙ্গ নিরখি',
তাহার দুই সখী,
করিয়া চোখোচখী,
কহিল ছাঁদে ॥

"হেতা আয় শরম্মই,
কথা-বারতা কই;
কেন লো প্রাণ-সই
উতলা অত?
ভাবিয়া হ'ল যে সারা,
ঠেকে কেমন ধারা,
ঠিক লো মণি-হারা
ফণীর মত ॥" ১৪১ ॥

সুরুচি অবাক্ মানি
হেরিল কানাকানি,
ভাবিল "কি না জানি
পাতিছে কল।"
বলিল "তোরা কি হ'লি!
যে দেখি গলাগলি,
কি এত বলাবলি,
আমায় বল্ ॥"

শরৎ, মধুর-স্বরে,
কহিল হাস্য-ভরে,
"বলিতে মানা করে,
মাধবী মোরে।
বলি তোর কানে কানে,
আয়্ লো এইখানে,
দ্যাখ্ সখীর পানে
ঠাহর কর্যে॥ ১৪২॥

"সন্ধ্যা-থেকে অই ধারা,
উঠিল সব তারা,
নয়নে বহে ধারা,
কথা না ফুটে।
নদী যবে এক টানে,
বহে সাগর-পানে,
ঠেকিলে কোন'খানে,
উথলি' উঠে!"

সুরুচি এতেক শুনি',
মনে প্রমাদ গুণি',
চলিল রুণ-রুণি',
সখীর পাশে।
বলিল ক্ষণেক-বই,
"ভাবিছ কেন সই?
ভাবিলে ক্রমশই
ভাবনা আসে॥ ১৪৩॥

"শুখায়েছে মুখ-খানি,
একটি নাহি বাণী,
এলিয়ে গেছে বেণী,
বাঁধিয়ে-দেই।

যে'তে কি হয় একেলা,
মো-সবে করি' হেলা,
গে'ছ ভোরের বেলা,
আইলে এই!—

"বলিব কি প্রাণে বাজে!
ও কি তোমায় সাজে!
গিয়াছ ধরা-মাঝে!—
কাঁপে হৃদয়!
অমন কি যে'তে আছে!
ও'তে কি দেহ বাঁচে!
লৌহ-পাষাণ ছাঁচে
গড়া ত নয়!" ১৪৪ ॥

ভাবনায় নিমগন
হইয়া এতক্ষণ,
বিরহিণীর মন
ছিল কোথায়!
আচম্বিতে ভাবে ধনী,
এসেছে গুণমণি,
শিহরিয়া অমনি
ফিরিয়া চায়।

ভ্রম যবে গেল ঘুচি',
বলিল আঁখি মুছি',
"জ্বালাস্‌নে সুরুচি,
সর্‌ লো সর্‌!
একান্ত বাঁধিবি যদি,
ফ্যাল্‌ আমায় বাঁধি,
মারিস্‌নে দগাধি',
মিনতি ধর্‌!" ১৪৫ ॥

এতেক দেখিছে কবি, ভাব-চক্ষে;
হেনকালে মায়ার তামসী-সখী আইল সমক্ষে।
অন্ধ তমো-রাশি,
কোথা হৈতে আসি'
স্বপ্ন-দেখা ঘুচাইল শেল হানি' বক্ষে॥ ১৪৬ ॥

দারুণ বিরহে, কবিবর দহে!
মরম ভেদিয়া বাহিরয় শ্বাস, যাতনা না সহে।
মনের হুতাশে,
বলিল "কোথা সে!"
বলিতে বলিতে, আর চক্ষে ধারা বহে॥ ১৪৭ ॥

"কোথা গেল আমার প্রাণের ছবি!
এ যে দেখি সরোবর!" কহে কবি জ্ঞান কিছু লভি'।
সখ্য-রসে দেখি',
বলে কবি "এ কি!"
সখ্য বলে "আশ্চর্য কিছুই নয় কবি! ১৪৮ ॥

"মায়া-রথে এস্যেছ মানস-ধারে,
বিলাস-পুরীতে চল' মায়া-মা'র আজ্ঞা অনুসারে।"
কবি বলে "হায়!
ছিলাম কোথায়,
এ'লাম কোথায় আর মুহূর্ত-মাঝারে!" ১৪৯ ॥

সখ্য বলে "এ সব মায়ার খেলা!
দেবীর আদেশে কবি অই দেখ আসিয়াছে ভেলা।
অই দেখ দোলে,
সরসীর কোলে!
সঙ্গে মোর যাবে যদি এ'স এই বেলা॥ ১৫০ ॥

"দেখিবে প্রমোদ-সনে করি' সখ্য,
কাল-রূপ তুরঙ্গে চাবুক-দিতে কেমন সে দক্ষ।
চক্ষে দিয়া ধূলা,
যা'বে দিন গুলা,
কোন্ দিক্ দিয়া গেল, হইবে না লক্ষ॥" ১৫১ ॥

তৃতীয় সর্গ

বিলাসপুর-প্রয়াণ

সূচনা

নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। সখ্য-রস প্রমোদ-রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলা ধূলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গ-দোষে কবি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মতো হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল—এ ঘটনাটিও কবির দুঃখানলে আহুতি দিল।

কবিবর পড়িয়া সখ্যের মোহে,
বিষণ্ণ মলিন মুখে ধীরে ধীরে তরণী আরোহে।
দাঁড় ধরি দাঁড়ী
নৌকা দিল ছাড়ি',
বস্ত্র বিছাইয়া ছাদে বসে যাত্রী দোঁহে॥ ১॥

কর্ণধার তরণী লইয়া চলে;
স্তব্ধ কিবা সরোবর—যামিনীর যেন মন্ত্র-বলে!
সুধাকর চন্দ্র
একাকী অতন্দ্র,
মোহিছে জগত-আঁখি কিরণ-পটলে॥ ২॥

ছপ্ ছপ্ শবদে চলিল তরী,
কতবার প্রফুল্ল কুমুদ-বন টলমল করি'।
শ্যাম তট-রেখা
দূরে যায় দেখা,
ক্রমে হয় তরুময় কাছে সরি' সরি'॥ ৩॥

কবি ভাবে "মন যে পিছুতে টানে!
কল্পনারে ফেলি-রাখি' কোন্ প্রাণে এ'লাম এখানে!
আসিয়া এ ঠাঁই,
ভাল করি নাই!
না দেখিলে সে আমায়, কি হ'বে কে জানে! ৪॥

"কোন্ লাজে এখন ফিরিতে চা'ব!
পূর্বে ভাবিলে না মন—এখন বৃথায় আর ভাব'।
সন্ধ্যা-গিরি-শিরে
কবে যা'ব ফিরে!
সখ্যের বন্ধন-পাশ কেমনে এড়া'ব॥" ৫॥

কর্ণধার তরণী ভিড়ায় পারে।
দাঁড় তুলি-রাখি দাঁড়ী ধ্বজি পোঁতে নৌকা বাঁধিবারে।
সখা দোঁহে তবে
নাবিল নীরবে।
পঙ্কে পাছে পড়ে পদ শঙ্কে বারে বারে॥ ৬॥

উত্তরিয়া দিব্য অপরূপ তটে
কবিবর বলিল চৌদিক্ হেরি' "মনোহর বটে!"
ক্ষণেকে হরিষ,
ক্ষণে চিন্তা-বিষ,
মুহুর্মুহু কল্পনা জাগে চিত্ত-পটে॥ ৭॥

সখ্য কহে "কি দেখ' রঙীন মাটি!"
কবি কহে "মাটি এ তো রঙীন—সুবর্ণ সে যে খাঁটি।"
সখ্য বলে "হার
মানিনু এবার!
তোমা সঙ্গে কথায় কেমনে বল' আঁটি॥ ৮॥

"কিন্তু সখে মাটি'কে ছাড়িয়া দিলে
শোভাশূন্য ভোঁ ভাঁ ছাড়া আর কিছু থাকে না নিখিলে।
জ্ঞানী জনে বলে—
মাটিতেই ফলে
চতুরবরগ ফল, ফ'লাতে জানিলে॥" ৯॥

হেনরূপ কহিতে কহিতে বাণী
উত্তরিল সখা দোঁহে যথায় বিলাস-রাজধানী।
যতেক বিলাসী
যায় হাসি' হাসি'
রঙ্গে উড়াইয়া কিবা রঙ্গীন উড়ানি॥ ১০॥

রস-ভরে বরষিছে রম্য তান;
বয়স্যে দেখিয়া কভু পুষ্প করে উপহার-দান।
নবোৎসবে মাতি',
ফুলাইয়া ছাতি,
চলিয়াছে যুব-দল খুলিয়া পরাণ॥ ১১॥

চারিদিকে ফুলের বাজার-হাট,
চলিতেছে বেচা-কেনা, মাঝে মাঝে চলিতেছে ঠাট।
কানন-গৌরব
কুসুম-সৌরভ
মন্দ-মৃদু গন্ধ-বহে করিছে ভরাট্॥ ১২॥

মাঝে-মাঝে অট্টালিকা উচ্চাকার;
বাতায়ন-দ্বার দিয়া দেখা-দেয় রূপ চমৎকার।
হেরি' কেহ হাসে,
কেহ বা নিশ্বাসে,
কবির তাপিত চিতে জনমে ধিক্কার॥ ১৩॥

ব্যগ্রপদে সখ্য-রস অগ্রসরে;
পশ্চাতে কবির মন আছে পড়ি' সন্ধ্যাভ্রশিখরে।
যেথা রাজ-সভা
উগরিছে প্রভা—
উত্তরিল দোঁহে সেথা ক্ষণকাল পরে॥ ১৪॥

দাঁড়াইয়া প্রভাময় সভাদ্বারে
যে দিকে ফিরায় আঁখি উল্লাসের তরঙ্গ নেহারে।
ডাহিনে ও বামে
রম্য থামে-থামে
লুটাইছে ফুলমালা ফুল-পত্র-ভারে॥ ১৫॥

সিংহাসনে বসিয়া প্রমোদরাজ
আমোদে আছেন মাতি, নাহি তাঁর কোনো আর কাজ।
জিনি ফুলধনু
সুকুমার তনু;
সরবাঙ্গে বিলসিছে কুসুমের সাজ॥ ১৬॥

অনিমেষ নয়নে দাঁড়ায়ে স্থির,
দুই ধারে হেলায় বৃহৎ পাখা দুই মহাবীর।
অপ্সরা কিন্নরী,
সিদ্ধা-বিদ্যাধরী,
কাঁপাইছে নৃত্য-গীতে রজনী-গভীর ॥ ১৭ ॥

চারিদিকে লোকের পড়িছে ঝাঁক,
কেহ দেয় সাধুবাদ, কারো মুখে নাহি সরে বাক্।
কেহ বা গরবে
থাকিয়া নীরবে
মনে-মনে গরল করিছে পরিপাক ॥ ১৮ ॥

মগ্ন-চিতে দেখিছে প্রমোদ-রায়,
কভু বলে "অপূর্ব !" কখনো "দিব্য !" কভু "হায় হায় !"
হাসি-হাসি মুখ,
ভুঞ্জিতেছে সুখ,
হেনকালে সখ্য-রসে দেখিবারে পায় ॥ ১৯ ॥

সখা-প্রেমে অমনি সকল ভুলি',
"আরে আরে এ'স এ'স" বলিয়া করিল কোলাকুলি।
সখ্য-রস কহে
"এত অনুগ্রহে
পড়িব পর্বত-চাপা ক্ষুদ্র আমি ধূলি ॥ ২০ ॥

"রত্ন যত সকলি রাজার ভোগ্য;
কবি-রত্ন এই যে দেখিছ, ইনি মুকুটের-ই যোগ্য।
কবির লেখনী
সুবর্ণের খনি,
কবির বচন-সুধা তাপের আরোগ্য ॥ ২১ ॥

"হে রাজন্ ! কবিতা-কমলিনীর
সবিতা নিরখ' এই ! বর-পুত্র সারদা-দেবীর !"
কবি কহে "আমি
করি পাগলামি,
তা' যদি কবিতা হয় ভাগ্য সে কবির !" ২২ ॥

হে রাজন্! কবিতা-কমলিনীর
সবিতা নিরথ' এই! বর-পুত্র সারদা-দেবীর!"
কবি কহে "আমি করি পাগলামি,
তা' যদি কবিতা হয় ভাগ্য সে কবির!" ॥ ১৯ ॥
হাস্য বলে "ও সব সংক্ষেপে সার'।
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার; পেটটি জানি সার
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো ॥ ২০ ॥
দূর-হৈতে প্রণমি সারদা-মায়,
কাছে না এগ'ই পাছে বীণার বাতাস লাগে গায়!"
নৃপ কহে "পেট যেমন নিরেট—
মাথাও তথৈবচ! সাবাস তোমায়!" ॥ ২১ ॥
বলে ভূপ কবিরে বসা'য়ে কাছে
"মন মোর বলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে।
কোথায় আলয়?" সখ্য-রস কয়
"বলিতে কুণ্ঠিত উনি না বিশ্বাস' পাছে ॥ ২২ ॥
"ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি" ॥ ২৩ ॥
বলে ভূপ উঠিয়া সোল্লাস মনে
"স্বপ্ন দেখিতেছি একি! করিয়াছি দেব-নিকেতনে

স্বপ্ন-প্রয়াণ দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থে কবি-কৃত সংশোধন

হাস্য বলে "ও সব সংক্ষেপে সার'!
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার;
পেট্‌টি জানি সার
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো॥ ২৩॥

"দূর-হৈতে প্রণমি সারদা-মায়ে
কাছে না এগ'ই পাছে বীণার বাতাস লাগে গায়ে!"
সখ্য বলে "কাছে
এগো'তে কি আছে?
ও-উদর লয়ে যদি নম' মা'র পায়ে—॥ ২৪॥

"ধরি' তোলে তোমায় নাহি মানব!
গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ-অবতার ভবে দুরলভ!"
হাস্য বলে "কৃষ্ণ
তিনি তো কনিষ্ঠ!
হলধর দাদা তাঁর মানে পরাভব॥" ২৫॥

বলে ভূপ কবিরে বসা'য়ে কাছে,
"মন মোর বলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে।
কোথায় আলয়?"
সখ্য-রস কয়
"বলিতে কুণ্ঠিত উনি না বিশ্বাস' পাছে॥ ২৬॥

"ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি॥" ২৭॥

বলে ভূপ উঠিয়া সোল্লাস-মনে
"স্বপ্ন দেখিতেছি একি! করিয়াছি দেব-নিকেতনে
কত কাব্য-পাঠ,
কত বাল্য-নাট!
কবিবরে দেখি আজি একি শুভক্ষণে!" ২৮॥

এত বলি বাঁধি' আলিঙ্গন-পাশে
বলে ভূপ "উদ্যানে বেড়াই চল' মলয়-বাতাসে।
মনে পড়ে কবি
নন্দন-অটবী?
বেড়া'তাম কি তখন মনের উল্লাসে!" ২৯॥

কবি কহে "কোথায় সে দিন হায়!
সন্ধ্যা না হইতে যবে পূর্ণিমা'র প্রেম-পিপাসায়
পূর্ব দিকে শশী
উঠি, আছে বসি,
ফুল কুড়া'তেছি মোরা বকুল-তলায়॥ ৩০॥

"আসিবে কি সে দিন জনমে আর?
প্রাতে দেখ নলিনীরে—নব শোভা কিবা চমৎকার!
অপরাহ্নে তা'র
ম্লান মুখাকার;
সায়াহ্নে দেখিবে নাই সে নলিনী আর!" ৩১॥

নৃপ কহে "ও সুর আজিকে নয়!
পরিয়াছে নব বসন্তের সাজ নিকুঞ্জনিলয়—
দেখিয়াছ তাহা?
দেখ অই! আহা
সুধীরে বহিছে আজ সুরভি মলয়॥" ৩২॥

হেনকালে আইল মদিরা ধনী,
"এ'স এ'স!" বলে ভূপ "সুধা এ'স মৃতসঞ্জীবনী!
অলির উচ্ছিষ্ট
কতই বা মিষ্ট—
বিম্ব-অধরের কাছে নিম্ব-হেন গণি! ৩৩॥

"গুঞ্জরিয়া ফিরি সারা-বনভূমি
পায় না যা কোনো অলি, পাই তাহা মুখপদ্ম চুমি।
মদন-ললনা
লালসা এ'ল না!
কোন্ প্রাণে তারে আজ ফেল্যে এলে তুমি? ৩৪॥

"তোমার ছোটো বহিন্ লালসা যে!
আনিতে তাহারে হয় সাজাইয়া বসন্তের সাজে!"
বলিল মদিরা
হইয়া অধীরা
"গিয়াছিল কালি সে পূজিতে ঋতুরাজে॥ ৩৫ ॥

"দেখিনু না তারে আজ কোনোখানে!
কাহার সংসর্গে আছে কোন্ স্বর্গে সে-ই তাহা জানে!"
নূপুরের রবে
চৌতি উঠি তবে
"আসিছে!" বলিয়া চায় দুয়ারের পানে॥ ৩৬ ॥

কাছ দিয়া যেমন গেল লালসা,
নিশ্বাসিল আদিরস—নাড়ী যেন ছাড়িল সহসা।
হাস্য বলে হেরি'
"সহে না যে দেরি!
আরম্ভেই দেখি এযে অন্তিমের দশা!" ৩৭ ॥

আদি বলে "বোক্যো না! চাহিয়া দেখ!
গিরি বলে কাহাকে—কাহাকে পৃথ্বী—অই ঠাঁই শেখ'!
কা'রে নীলোৎপল,
কা'রে বিম্বফল!
হাসির বদলে শেষে কান্না লয়্যে থেক্যো॥৩৮॥

"আহা আহা! চঞ্চল কমল-নেত্র
মরি কিবা করিছে ভান!
ভুরু-ধনুতে করে কুরু-ক্ষেত্র!
তনুতে নাহি রহে প্রাণ!

"বাসায় যাবে চলি আশায় বধি
না রাখিয়া চরণ-চিহ্ন।
তখন বলিবে 'হা দারুণ বিধি!
শুভ নাই মরণ ভিন্ন'!" ৩৯॥

নৃপ কহে "লাবণ্য-সুধার খনি!
মুখখানি দেখিলে চাঁদের মুখ শুখায় অমনি!
নয়নের ছাঁদে,
মৃগী পড়ে ফাঁদে!
চোরা ছোরা হানে প্রাণে দুরন্ত চাহনি!" ৪০॥

লালসারে বলে তবে "কবি ইনি—
ই'হারে শুনাও গীত!" এত শুনি নবীনা কামিনী
যৌবন-ধরমে
শরমে ভরমে
চাহে মুহু কবি-পানে মন-উন্মাদিনী॥ ৪১॥

যুবতীরে নৃপতি সাহস-দানে
যত বলে "গাও গাও!" ততই সে পরাজয় মানে।
গীতটি যেমনি
ধরিল রমণী,
নীরব অমনি সব—যে আছে যেখানে! ৪২॥

"আহা আহা!" "অমৃত—অমৃত!" বলি'
মকরন্দে অলি যথা সুধাস্বরে কবি গেল গলি।
গীত-মাত্র পিয়া
রহে যেন জিয়া!
শুনিতে শুনিতে আঁখি উঠিল বাদলি'॥ ৪৩॥

নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহে কবি
"কে বুঝে তোমার লীলা! এযে সেই পুরাণো পুরবী-
যাহা তার-স্বরে
প্রাসাদ-শিখরে
গাহিতাম দু-সখায় অস্তে গেলে রবি!" ৪৪॥

কবি-প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভূপ
সঁপিল বয়স্য-ভাবে পুষ্প এক অতি অপরূপ।
কবি নত হয়্যে,
কর পাতি' লয়্যে
সখ্য-রসে বলিল, "থাকিতে-নারি' চুপ॥ ৪৫॥

"ওহে সখ্য! প্রেম-সিন্ধু সুদুস্তর!
পার হ'ব কেমনে বলিতে-পার'? ব্যাঘাত বিস্তর!"
সখ্য-রস কয়
"পুষ্প ও ত নয়,
প্রস্তর বিঁধিতে-পারে এমনি অস্তর!" ৪৬ ॥

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম,
বলিল "যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম!
ভঙ্গ-দিতে রণে
পারি বা কেমনে?
অতএব দেখ' মোর সাহসের কর্ম!" ৪৭ ॥

এতেক বলিয়া বাণী, কবিবর,
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর।
লালসা নিরস্ত্র,
সামলায় বস্ত্র,
হাসিয়া কুড়ায় পুষ্প, অংগ থর থর॥ ৪৮ ॥

লালসার উথলিতে মনস্কাম,
শরমে মরমে মরি', গীতে দিল ক্ষণেক বিরাম।
কি যেন আটকে
ফিরিয়া নিরখে!
নানা ভানে রাখে স্থানে মেখলার দাম॥ ৪৯ ॥

গীত-গান যেমন হইল ভঙ্গ,
মালা-চ্ছলে লালসার গলে কবি সঁপিল অনঙ্গ।
গলে পেয়ে মালা
বিলাসের বালা,
তুল্য-রূপ মূল্য দিতে হানিল অপাঙ্গ॥ ৫০ ॥

কহে কবি "দিয়া-ফেলিয়াছি হিয়া জনমের মত!
আছে কি আমার যে আমায় তুমি মারিতে উদ্যত
চোখাইয়া চাহনি—বিষম ভুরু-ধনুকের বাণ!
কাহার বধিতে প্রাণ ঘোরতর পাতিছ কামান! ৫১ ॥

"মরায় মারিছ কেন! একান্তই অধীন মানব—
তবে কেন মোর প্রতি এ-হেন দারুণ উপদ্রব!
অমন ত হন্তারক দুটি আর দেখে নাই কেহ!
কি চাও বল' না! চাও জীবন না হৃদয় না দেহ! ৫২ ॥

"লও লও এখনি সকল লও! কি যে ও চাহনি
কি বলিব! ফিরাও উহারে শীঘ্র! কিছু নাহি গণি
অসাধ্য উহার! পারে অবনীরে রসাতলে দিতে!"
বিরমিয়া মুহু কবি আরম্ভিল আবার বলিতে! ৫৩ ॥

"বসন্ত-বায়ুতে যথা কুসুমিত নিকুঞ্জ-বিপিন
মরমে মরিয়া হয় সমীরের একান্ত অধীন;
ফুলের মঞ্জরী হ'তে সউরভ-নিশ্বাস বেরোয়,
যে-দিকে নোয়ায় মৃদু-সমীরণ, সেই-দিকে নোয়; ॥ ৫৪ ॥

"সেই দশা করেছ আমার—চাই রাখ' চাই মার'!
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার'
নয়ন-ভঙ্গিতে! বল' বল' তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্মভেদী ঋণ!" ৫৫ ॥

এত বলি' হৃদয় ঢালিয়া-দিয়া
লালসার পানে চায়, সুগভীর কটাক্ষ ফাঁদিয়া।
তাহে সুবদনী
পরমাদ গণি',
এগোইতে নাহি পারে বিভ্রমে বাঁধিয়া ॥ ৫৬ ॥

একবার বলয়-অঙ্গদ সারে,
একবার বামাঙ্গিনী মেখলায় ফিরিয়া নেহারে।
গোলাব-কণ্টকে
বস্ত্র বা আটকে,
ফিরিয়া-ফিরিয়া তাই হেরে বারে বারে ॥ ৫৭ ॥

হাস্য বলে "এবার আমার পালা!
কথা-ই শুনে না কেউ, হ'ল মোর ভস্মে ঘৃত ঢালা!
দাগিধ-মারে, রূপ,
তা'র বেলা চুপ!
গুণ চেঁচাইয়া খুন, তা'র বেলা কালা! ৫৮॥

"রসরাজ! কি বকিছ বিড়্বিড়্?
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ-মাজা নিতম্ব নিবিড়!
ব্রাহ্মণের ছেলে
খে'লে কি না খে'লে,
সে তত্ত্ব চুলোয় গেল, অই দিকে ভিড়!" ৫৯॥

আদিরস বলিল "কি ঘোর পাক
খেলিতেছে ভুজঙ্গিনী আমা-সনে! হয়েছি অবাক্
দেখি লালসার
নব ব্যবহার!
ফিরিয়াও চাহিল না, কথা দূরে থা'ক্! ৬০॥

"কবির ঘুচা'ব আজ কবিপনা!
নাবিতেছে অই দেখ মনোরথ—আসিছে কল্পনা!
সভাব সমক্ষে
লালসার বক্ষে
ছুড়িয়া মারিল ফুল! সাহস অল্প না! ৬১॥

"শেল যেন হানিল আমার বক্ষে!
নৃপতি যে সহায়! নহিলে আজ থাকিত না রক্ষে!
তোমার তো ভাই
গতি সব ঠাঁই!
কল্পনারে কহ গিয়া দেখিলে যা চক্ষে!" ৬২॥

হাস্য বলে "থাকিলে হবে কি গতি!
সেথায় বেয়াড়া গতি! তার মতো কন্যা গুণবতী
আরেকটি নাই!
বলিব কি ভাই—
নখাগ্রে ভারত তা'র মুখাগ্রে ভারতী॥ ৬৩॥

"সম্মুখে এই যে সব নিতম্বিনী—
আমায় দেখিলে বলে—'সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ইনি'।
কল্পনা তরুণী
হাসেন তা শুনি',
বলেন 'উদর দেব'! জানেন না তিনি—॥ ৬৪ ॥

"উদরেই ব্রহ্মণ্যদেবের বাসা!
গলায় গলায় যবে মিষ্টান্ন তাহাতে হয় ঠাসা—
এউ ঢেউ ধ্বনি
বেরোয় অমনি!
মিষ্টান্ন বিহনে কভু মিষ্ট হয় ভাষা? ৬৫ ॥

"তিক্ত-মুখে হ'য়ে যদি অগ্রসর
বারতাটি শুনাই—কবি সে হ'বে গুণের সাগর,
শম্মা মিথ্যাবাদী!"
হাসি বলে আদি
"সে জন্য ঠাকুর তুমি হয়ো না কাতর॥ ৬৬ ॥

"যে মালা-ছড়াটি আজ ও পামর
লালসার গলে দিল—কল্পনা তাহার কারিকর।
সেই ফুলডোর
ধরি দিবে চোর—
তা যদি আনিতে পার' মুঠার ভিতর॥" ৬৭ ॥

হাস্যরস কৌতুকের পে'লে গন্ধ
কার সাধ্য ঘরে চাবি দিয়া তা'রে করি রাখে বন্ধ।
লালসার কাছে
তে'ই ভিক্ষা যাচে
"সুন্দরি! ভিক্ষাং দেহি—বাড়ুক আনন্দ!" ৬৮ ॥

মৃদু হাসি' বলিল মদনাঙ্গনা
"ঘরে ধনী—তবে কেন দুয়ারে দুয়ারে আনাগনা!"
হাস্য বলে "তাঁর
খুরে নমস্কার!
খালি হাতে তাঁর কাছে জানা'লে বেদনা—! ৬৯ ॥

"বচন শুনায়ো-দে'ন কড়া কড়া!
পায়ে দিতে ব্রাহ্মণীর তৈল লাগে মোর ঘড়া ঘড়া!
কবরীতে তাই
জড়াইতে চাই—
ভিক্ষা যদি পাই আজ অই মালা-ছড়া ॥ ৭০ ॥

"কান্ত-গলে পড়ুক্ প্রেমের ফাঁস—
দেও উ'টি আমায়! না দেও যদি ফেলিব নিশ্বাস।"
মন্যু-ভয়ে বালা
কবির সে মালা
হাস্যরসে দিল যেই হ'ল সর্বনাশ ॥ ৭১ ॥

হেতা কবি ধরিয়া সখ্যের কাঁধ
ধীরে পায়চালি করি নিরখিছে পূর্ণিমার চাঁদ।
সখ্য বলে "বাণ
করিল সন্ধান
যখন—ভাবিনু আমি ঘটে বা প্রমাদ ॥" ৭২ ॥

"চুপ কর!" কহে কবি "শুন গান!
হায় রে! থামিয়া গেল! করিলে না, সখ্য, অবধান!
অবলার হিয়া
তাপে উথলিয়া
গভীর নিশ্বাসে যেন হ'ল অবসান ॥" ৭৩ ॥

এত বলি লতাকুঞ্জে একবার
উঁকি দিল যবে কবি, দুনয়ন ফিরিল না আর!
যেন কুঞ্জবন
আপনারই মন,
কল্পনা বসিয়া আছে পদ্মাসনে তা'র ॥ ৭৪ ॥

সুভুজ-মৃণালে কর-কিসলয়,
তদুপরি কপোল-পঙ্কজ শোভে, ম্লান অতিশয়;
ভাসিছে বিরলে
নয়নের জলে;
এ জনার এ মূরতি কা'র প্রাণে সয়! ৭৫ ॥

এ বিপদ ঘটাইল যেই মালা,
করে করি' তুলিল সেই-টি যেই কলপনা-বালা,
কুপিত সে ফণী
দংশিল এমনি
ছুড়িয়া ফেলিল ধনী, নিবারিতে জ্বালা॥ ৭৬॥

লইয়া তাহারি এক ছিন্ন ফুলে,
নয়নের জলে, কলপনা তা'রে, বাঁচাইয়া তুলে।
পাপড়ি উলটি'
নিরখে ফুলটি,
ধরিয়া কোমল বোঁটা দুইটি আঙুলে॥ ৭৭॥

পুষ্প সে যে হৃদয়ের দরপণ!
অবলা-লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ
তার দলে দলে!
তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ॥ ৭৮॥

"মনঃ প্রীতি নিরখিয়া ভাবিতেছি মনে মনে
শুখা'য়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হ'বে কেমনে!

"তোলো তোলো হে মলয় ইহার আঙুল দুটি ধরি-
আর উঠিবে না!
কেন আর ঘুরিছ গো মধুকর গুন্ গুন্ করি—
আর ফুটিবে না!
মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়—
ভুলানে কথায় আর কাণ দিবে কি ও!" ৭৯॥

আর না থাকিতে পারি' সঙ্গোপনে,
দেখা-দিয়া কল্পনারে কহে কবি সুধা-সম্ভাষণে;
"নিকটে এ'গই
তা'র যোগ্য নই!
বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে! ৮০॥

"ডালপালা-জানালার দ্বার দিয়া
শশী দেখে মুখ-শশী নভস্তলে বসি' বার-দিয়া!
মরে মনোদুখে,
হাসে তবু মুখে!
মেঘের আড়াল পে'লে বাঁচিত কাঁদিয়া!" ৮১ ॥

বলিল কল্পনা-বালা মৃদু হাসি'
"কা'রে কাঁদাইয়া-আসি' শ্রবণে ঢালিছ সুধারাশি!
কহিতে মধুর
তোমরা চতুর!
হরিণী শিকার কর' বাজাইয়া বাঁশি॥ ৮২ ॥

"গলায় দিনু যে মালা—তাহা কই!"
কবি বলে "হৃদয়ের ধন সে যে—প্রেম তারে কই!
সেই ফুলমালা
মোর জপমালা!"
কহে বালা "জপমালা তা যদি এতই—॥ ৮৩ ॥

"হরিল না জানি কোন্ সুবদনী!"
কবি বলে "আপনি হরিয়া লয়্যে জান না আপনি!"
শুনি' বলে বালা
"এই লও মালা!
ফিরাইয়া-দেও গিয়া ফণিনীর মণি!" ৮৪ ॥

কবি ডাকে "যেয়ো না, যেয়ো না" বলি',—
ধরায় ছুড়িয়া মালা ত্বরায় কল্পনা যায় চলি'।
কবি বলে "হায়
একি হ'ল দায়!
বজ্র হানি' চলি'-গেল কনক-বিজলি!" ৮৫ ॥

হাস্য বলে "বিষম ভাঁটার টান,
তরণী ফিরে কি আর! বাধা দিলে বাধিবে তুফান!
আসিয়াছে সখ্য
করিয়াছ লক্ষ?
না কেবল করিতেছ তরুণীর ধ্যান!" ৮৬ ॥

বলি'-উঠে কবিবর হা হুতাশে
"রক্ষা কর' আমায়! বাঁচিনে হায়! গেলাম! কোথা সে?
আর কি এ চোক
পিবে সে আলোক!
আর কি জুড়া'বে কাণ সে কোকিল-ভাষে!" ৮৭॥

সখ্য বলে "কথাটা কি?" কবি কয়
"কথায় কি হ'বে আর, ভোলা ভাল, তোলা কিছু নয়!"
সখ্য-রস কয়
"তাপিলে হৃদয়
সময়ে শময়ে, যদি অনাবৃত হয়॥" ৮৮॥

কবি কহে "কর্য়ো না গো জ্বালাতন!
অসময়ে নাহি রুচে, রসময় কথোপকথন!
বিষময় দুখ
না দেখায় মুখ,
ভূমি তলাইতে চায় ফণীর মতন॥ ৮৯॥

"বিষ-বীজ পাইলে হৃদয়ে স্থল,
অঙ্কুরিতে নাহি চায়, শিকড়িতে যত তা'র বল!
বিদরিয়া প্রাণ
ব্যাপে সব স্থান,
টানিয়া বাহির করা যন্ত্রণা কেবল॥" ৯০॥

দুনয়ন কবির মৃত্তিকা-পানে;
মোটা মোটা ঝরিতে-লাগিল ফোঁটা, বারণ না মানে।
সখ্য বার-বার
বলিবে কি আর!
কবির মনের জ্বালা, কবি শুধু জানে! ৯১॥

বলি-উঠে জ্বলিয়া মরমাঘাতে
"যা'ক্ যা'ক্—সব যা'ক্! সমুদায় যা'ক্ অধঃপাতে!
কিছুতে আমার
কাজ নাই আর!
প্রেমের যা' ফল তা' পে'লেম হাতে হাতে॥ ৯২॥

"প্রেম তোর মৃদু-প্রাণ অতিশয়,
পথ-ঘাট কিছু না জানিস্, অন্ধ বলিলেই হয়,
পৃথিবী-অরণ্যে
আইলি কি জন্যে!
ফিরো-যা যেখানে তোর জনম-আলয়!" ৯৩ ॥

নিশ্বাসিয়া, কর সমর্পিয়া বুকে,
তরু-মূলে ঠেস্ দিয়া বসে কবি মরমের দুখে।
বাষ্প, হয়্যে লোল,
বাহিয়া কপোল,
কলঙ্ক দাগিতে-থাকে ম্লান শশি-মুখে॥ ৯৪ ॥

সখ্য বলে "শোভে না তোমায় বলা,
সকল রোগের অউষধ আছে, হয়্যো না উতলা।
কল্পনা-কুমারী
হইবে তোমারি;
পাষাণ ত নহে ধনী, মৃদু সে অবলা! ৯৫ ॥

"চল' রাজ-সভায় বসি-গে যাই;
নৃপ-দরশন মাগে বীর-রস, সমারোহ তাই।
যত বিদ্যাধরী
যতেক কিন্নরী,
সবে গেছে সভায়, উদ্যানে কেহ নাই॥" ৯৬ ॥

এত বলি' সখ্য-রস, কবিবরে
সঙ্গে করি' লয়্যে-গেল প্রমোদের রাজ-সভা-ঘরে।
বসিল যখন
বয়স্য-দুজন,
বীর-রস প্রবেশিল ধীর-পদ-ভরে॥ ৯৭ ॥

তাহাতেই বীরের চরণ-দাপে
সভার চমক লাগে, ভবনের ভিত্তি-মূল কাঁপে।
বজ্র-সম কায়
অগ্নি উগরায়,
অরি-শত ডরি'-যায় ভীষণ প্রতাপে॥ ৯৮ ॥

বলে বীর ফিরিয়া পশ্চাৎ-পানে
"ভয় নাই চলি' এ'স" এত বলি' সঙ্গে ডাকি'-আনে
প্রমদা-নামিনী
মুগ্ধা-কামিনী;
দাঁড়াইয়া ছিল ভীরু দ্বার-সন্নিধানে॥ ৯৯॥

বলে বীর "চলি' এ'স নাহি ভয়;"
লজ্জা সামালিতে-গিয়া গোঁয়াইয়া কতক সময়,
ধীরে ধীরে অতি
আইল যুবতী,
নয়ন-চকোরে সব, করি' চন্দ্রোদয়॥ ১০০॥

বীর বলে "রাজার দুহিতা ইনি,
অরাতি-কিরাতি হস্ত এড়াইয়া ভয়ার্ত হরিণী
সিংহাসন-আগে
প্রতীকার মাগে;
নৃপ-বিনা আর্ত-দুখে আর কেবা ঋণী॥" ১০১॥

"অবশ্য অবশ্য" বলি' নরপাল
বসাইলে প্রমদারে, নিবেদিল আসি' দ্বারপাল
"দূত এক জন
মাগে দরশন;"
নৃপ ভাবে "কোথাকার আইল জঞ্জাল!" ১০২॥

বলে "যদি একান্তই থাকে কাজ,
আসুক।" কাজের নামে ভূপতির শিরে পড়ে বাজ!
দূত যে আইল
তা'রে পাঠাইল
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-রাজ॥ ১০৩॥

কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইলে শেষ
নিবেদিল রাজ-দূত, "কথা এক আছয়ে বিশেষ।"
নরপতি বলে
"এই সভাস্থলে
বলিতে যা' চাহ' বল', নাহি ভয়-লেশ॥" ১০৪॥

দূত বলে "অল্পই আমার বাণী;
অপ্সরা প্রমদা-নামে, ছাড়িয়া পাতাল-রাজধানী,
করিল প্রস্থান;
পাইনু সন্ধান,
বিলাস-নগরী-মাঝে আছে সে ইদানী ॥ ১০৫ ॥

"রসাতল-রাজের মানস এই
(কাড়ি-লৈতে যদিও পারেন তিনি ইচ্ছা-করিলেই)
ভেস্যে-যাওয়া ফুলে
ফিরা'বেন কূলে
মৃদু-বাক্য-সমীরণে; আসিয়াছি তেঁই ॥" ১০৬ ॥

ভূপ বলে "এ অতি সামান্য কথা,
মন্ত্রণা তথাপি চাই, রাজত্বের যেইরূপ প্রথা।
স্থির যা' হইবে
শুনিতে পাইবে;
বিচারের কিছুমাত্র হ'বে না অন্যথা ॥ ১০৭ ॥

"পূজাগারে এখন বিশ্রাম হো'ক্।"
হেন অবসরে প্রমদার প্রতি দূতের দু-চোক
তীরের মতন
হইল পতন;
রাহু-চক্ষে প'ল যেন চাঁদের আলোক ॥ ১০৮ ॥

সেই দণ্ডে নয়ন-সলিলে ভাসি'
প্রমদা-চপলা প'ল নৃপের চরণ-তলে আসি'
বলে "অনাথারে
অকূল পাথারে
ভাসায়ো না হে রাজন্, রাজ-ধর্ম্ম নাশি ॥" ১০৯ ॥

নরপতি করিল অভয়-দান,
"কূলে আসিয়াছ তুমি, শান্ত কর তাপিত পরাণ।
কোকিল-গলায়
মন যে গলায়,
হেনজনে দুঃখ দেয় কে হেন পাষাণ!" ১১০ ॥

রাজদূত বলিল "শুন' রাজন্!
শুন' গো তোমরা সবে, আছ হেতা যত সভাজন!
এই সুত্রে যদি
বহে রক্ত-নদী,
আমি তবে হইব না দোষের ভাজন॥" ১১১॥

বীর-রস বলি'-উঠে "শুনিলাম!
বল' যাও তোমার ভূপেরে, যদি চাহেন সংগ্রাম,
কোটি উগ্র শর,
হ'বে অগ্রসর!
বহুদিন শুনি নাই সমরের নাম! ১১২॥

"হৃষ্ট হইলাম শুনি' তোমা-কাছে!
এখন বিদায় মাগি' যাও; যাইতেছে পাছে পাছে
কালান্তক যম!
কহিলে উত্তম—
শ্যেন-সনে কপোতী থাকুক তাল-গাছে! ১১৩॥

"কুল পা'ক্ নলিনী গজের পদে!
ভয়ে কাঁপে যে হরিণী ধনুকের টঙ্কার-শবদে,
ব্যাধের সম্মুখে
বিচরুক্ সুখে!
এই কথা শুনাইছ রাজ-সভাসদে?" ১১৪॥

দূত বলে "ছিল যাহা বলিবার,
বলিলাম; তাহার অধিক আর নাহি অধিকার!"
ভূপ বলে "সখ্য
করিয়াছ লক্ষ?
ঝঞ্ঝার পূরব-ক্ষণে মেঘের সঞ্চার!" ১১৫॥

সখ্য বলে "গোপনীয় কথা আছে;
এখনি বলিতে হ'ল, সংগ্রামে বিরত হও পাছে।"
নৃপ কহে তায়
"যাহা প্রাণ চায়,
মুক্ত কণ্ঠে বল' তাহা বয়স্যের কাছে॥" ১১৬॥

সখ্য বলে "এনেছি আদেশ-পত্র;
যৌব-রাজ্য কর' ভোগ সঙ্গে লয়্যে সকল কলত্র,
রণে লভি' জয়;"
নরপতি কয়
"ভর্ৎসনা কোথায়—কোথা সিংহাসন-ছত্র!" ১১৭ ॥

পত্র পড়ি' বলে ভূপ সংগোপনে
"পিতা মোরে করিবেন এত দয়া নাহি ছিল মনে!
আসিতেছে সৈন্য
নিবারিতে দৈন্য,
আসিতেছে মৈত্র-দেব অনুরাগ-সনে॥ ১১৮ ॥

"উড়াইছে নিশান উল্লাস-হর্ষ!
আসিতেছে স্বাস্থ্য দাক্ষ্য কৌশল, সমর-দুর্ধর্ষ!
একা বীর-রস
সহস্রেক দশ!
উঠি এ'স বীর-রস আছে পরামর্শ॥" ১১৯ ॥

ভৃত্য-গণে বলে ভূপ "প্রমদায়
অন্তঃপুরে লয়্যে-যাও;" এত বলি' গেল মন্ত্রণায়
বীর-সখ্য-সনে;
এই কু-লগনে
জন-দশ ছদ্ম-বেশী পশিল সভায়॥ ১২০ ॥

নৃপ-সাথে গেল যেই বীর-রস;
ছদ্ম-বেশী দৈত্য-গণ, বক্ষে সেই বাঁধিয়া সাহস,
প্রমদারে ধরি'
লয়্যে-গেল হরি';
আর্ত-নাদে যুবতী জাগায় দিক্‌দশ॥ ১২১ ॥

এমনি, সাধিল কাজ, দ্রুতবেগে,
সভা-সুপ্ত যত লোক নিজ নিজ প্রাণের উদ্বেগে
আড়ষ্ট হইয়া
রহিল চাহিয়া!
কপোতী লইয়া শ্যেন লুকাইল মেঘে॥ ১২২ ॥

"ধর্ ধর্ মার্ মার্" শব্দ উঠে;
এলো-কেশে এলো-বেশে চারিদিকে পদাতিক ছুটে।
দণ্ড দুই তরে
রাজ-সভা ঘরে
তরাসে কাহারো মুখে কথা নাহি ফুটে॥ ১২৩॥

হেন কালে নৃপের সমীপে গিয়া
বিদায় মাগিল কবি; সখ্য কহে "কিসের লাগিয়া
উচাটন-মতি!"
বলে নরপতি
"এ রাত্রে তোমায় দিব কোথায় ছাড়িয়া॥" ১২৪॥

কবি কহে বিরস-বদন করি',
"ক্ষম' আজি আমায়, প্রমোদ-রায়, করুণা বিতরি';
জীবনের মত
আছি অনুগত;
আমায় বিদায় দেও আজিকে-শর্ব্বরী॥" ১২৫॥

এত শুনি' কহিল প্রমোদ-রায়,
"নিতান্তই হইলে নির্দয় যদি, তবে নিরুপায়!
সখ্য-নিদর্শন
করহ গ্রহণ;"
এত বলি' কবিবরে অংগুরী পরায়॥ ১২৬॥

কবিবর প্রমোদেরে অভিবাদি'
যখন চলিয়া যায়, সখ্য-রস হ'ল প্রতিবাদী।
হয়্যে অনুগামী
বলে হিতকামী,
"আমি যে নৃপের কাছে হ'ব অপরাধী!" ১২৭॥

সভা-ভঙ্গে যখন বিলাস-পুরী
হইয়াছে প্রশান্ত; যখন দিব্য পূর্ণিমা-মাধুরী
বিপিন ছায়ায়
ঢালিয়াছে কায়;
সখা দোঁহে আইল বিনোদ-বনে উঁরি'॥ ১২৮॥

বিনোদ-অটবী, ভ্রমিতেছে কবি,
মলয়ের সমীরণ মনানলে ঢালিতেছে হবি।
এ ফুল ও ফুল
করিয়া নির্মূল,
ধরায় ছড়ায় শেষে আরাম না লভি'॥ ১২৯॥

নিশ্বাস ছাড়িয়া বক্ষে দিল হাত,
পঞ্চবাণ যথায় দিয়াছে করি' গভীর নিখাত।
প্রিয়া-লাগি হিয়া
উঠে ব্যাকুলিয়া
কেমনে কোথায় তা'র পাইব সাক্ষাৎ॥ ১৩০॥

একান্ত হইয়া কবি অসহায়,
নিকুঞ্জের আড়ালে বসিল-গিয়া করি' হায় হায়।
চৌদিগে অটবী
কুসুম-সুরভি;
প্রাণ কিন্তু চাহে যা'রে সে নাহি সেথায়॥ ১৩১॥

বলে কবি "অরণ্যে এখন কাঁদ্!
কল্পনা-কুপিতা-নদী না মানিল পীরিতির বাঁধ!
হায়! কি কুক্ষণে
লালসার সনে
দেখা হ'ল! হাতে যেন আনি' দিল চাঁদ॥" ১৩২॥

সখ্য কহে "মদিরা'র মা নাগিনী;
লালসার মা অপ্সরা; কাম-কন্যা দুই গো ভগিনী
বিনাশের দ্বার!
নারী ও-দোঁহার
পীরিতে যে মজে তারে ফিরিতে দেখিনি॥ ১৩৩॥

"বাহুপাশে বিলাসে অমরাপুরী—
চাহনিতে মন্দাকিনী! সুধা জিনি বচন-মাধুরী।
মোহিতে মরম
জানায় শরম—
শানায় হৃদয়-শাণে বিষ-মাখা ছুরী॥" ১৩৪॥

কবি কহে "কল্পনারে জান ত হে?
লতা আর তরু সম এক সঙ্গে বাড়িয়াছি দোঁহে।
বিরহে তাহার
প্রাণে বাঁচা ভার—
তবু সে গেল গো চলি, না ব'লে না ক'হে॥ ১৩৫॥

"না লালসা আমার, না আমি তা'র!
সে গাইল, আমি দিনু ফুল-মালা, শোধ গেল ধার!
সাজাইব তোরে
প্রেম-ফুল-ডোরে!
বাঁধসনে আমায়, দেখা দে এক বার॥ ১৩৬॥

"কল্পনা! বিলম্ব করিও না আর! এ'স ত্বরা করি'!
যাহার যা', তাহা লয়্যে থাকুক্, আমরা চল' সরি!
চল যাই পড়ি-গে প্রকৃতি-মা'র চরণ-সরোজে—
সকলি সরল যথা, সকলি পরের মন বোঝে॥ ১৩৭॥

"দেখিতে না পারে দুঃখ কাহারো—অতীব বোধবান্
বনস্পতি ওষধি সরিৎ সিন্ধু প্রস্তর পাষাণ!
আমরা যখন যা'ব বন-সামিয়ানা-তল দিয়া,
সম্মুখে হরিণ আসি' দাঁড়াইবে ঘাড় উঁচাইয়া॥ ১৩৮॥

"শ্যাম উতপল-আঁখি নিপাতিয়া জিজ্ঞাসা-মানসে;
আমরা বলিব 'ভয় নাই মৃগ বেড়াও হরষে!
তোরা-সবে যেমন বন-বিহারী, আমরা তেমতি;
বন্ধু বলি' লয়্যে-যা যেখানে তোর সাধের বসতি॥' ১৩৯॥

"ঠাহরিয়া ক্ষণ-কাল স্থির র'বে হরিণ-শাবক;
শাখা-যুত দুই শৃঙ্গ দোঁহে মোরা করিব আটক।
ছাড়াইতে শৃঙ্গ-দুই হরিণ-শাবক রহি' রহি'
বাঁকাইবে ঘাড় মনোহর নাটে, উপদ্রব সহি'॥ ১৪০॥

"বলিব তাহারে 'অগ্রে অগ্রে যাও পথ দেখাইয়া;'
যেখানে যে'তেছি মোরা পাখী-সব উঠিছে গাইয়া,
গুঞ্জরিয়া অলি মুখ-পদ্মে তব পড়িছে ঢলিয়া!
আর নারি সখ্য-রস—উঠিয়াছে আগুন জ্বলিয়া! ১৪১॥

"কেনই বা কাঁদিতেছি এত করি'!
বন্ধু-জনে কষ্ট আর দিব না, একেলা আমি মরি!"
বলি' দ্রুত-গতি
উঠে ছন্ন-মতি,
ধরি' রাখে সখ্য-রস স্তব-স্তুতি করি'॥ ১৪২॥

প্রমত্ত বারণ কি বারণ শুনে?
অবোধেরে বাঁধিতে কি পারা-যায় প্রবোধের গুণে?
হায় রে প্রবোধ!
এই তোর বোধ—
বসনে বাঁধিতে চা'স জ্বলন্ত আগুনে! ১৪৩॥

কহে কবি "ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া,
বনে চলিলাম আমি তোমা-কাছে বিদায় মাগিয়া!"
এত বলি' বাণী
শান্তি নাহি মানি'
বাণবিদ্ধ মৃগ-সম চলিল ভাগিয়া! ১৪৪॥

এক রোখে কবিবর চলিয়াছে!
থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার যায়, বাধা পে'লে গাছে।
সখ্য ডাকে তায়
"কোথায় কোথায়!"
কথায় যে দিবে কাণ, সে কি আর আছে! ১৪৫॥

মনোমাঝে জাগিছে বিধু-বয়ান!
চলিছে-যে কবিবর করিছে-সে তাহারি ধেয়ান!
প্রমোদ-রাজার
যেই অধিকার,
লঙ্ঘিয়া তাহার সীমা করিল প্রয়াণ॥ ১৪৬॥

আচম্বিতে থামিল ঝিল্লির রব!
নিস্পন্দ হইল বায়ু, কি যেন করিয়া অনুভব!
তমোময় দ্রুম,
নিঃশব্দ নিঝুম,
হেলা-দোলা ক্ষান্ত-দিয়া স্থির রহে সব॥ ১৪৭॥

ব্যাকুলিয়া-উঠিল কবির চিত্ত;
ক্ষণকাল বুঝিতে-নারিল কবি, কেন কি নিমিত্ত!
অরণ্য ঘোরালো,
হয়্যে-ওঠে আলো,
নিশি না পোহা'তে যেন উঠিল আদিত্য! ১৪৮ ।

দেখে কবি সম্মুখে, অবাক্ মানি',
জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি! সাক্ষাৎ যেন ত্রিদিবের রাণী
দাঁড়াইল আসি'
অন্ধকার নাশি'!
নাম তাঁর চেতনা, কহেন দৈব-বাণী॥ ১৪৯॥

কহে দেবী "এ হেন বিজন স্থানে
ফিরিতেছ কে তুমি এমন করি', ভয় নাই প্রাণে!
রবি যে কেমন
জানে না এ বন,
দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি-অনুমানে॥ ১৫০॥

"দেখিয়াও তবু কি দেখিতেছ না!
বিষাদ-অরণ্যে আর কিছু নাই, কেবলি শোচনা!
এই রাত্রি-বেলা
চল্যেছ একেলা,
পাতালে হ'তেছে গতি নাহি বিবেচনা!" ১৫১॥

নমি' কবি চেতনা-দেবীর পায়
জিজ্ঞাসিবে যেমন "এখন মোর কি হ'বে উপায়!"
দেখিল অমনি
নাহি সে রমণী,
ভাবে "কা'রে দেখিলাম চকিতের প্রায়!" ১৫২॥

ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক্ করি' একাকার।
শাখা ঠেকে গায়ে,
বাধা লাগে পায়ে,
বিষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার॥ ১৫৩॥

ডাকিলে সাড়া-দিবার নাহি লোক!
নিশ্বাসিয়া-উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক!
দারুণ ব্যাপার!
অরণ্য অপার
শাখা-বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক॥ ১৫৪॥

কভু বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি' তরু-শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
ব্যজিয়া যায়।
কভু বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি' ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায়॥ ১৫৫॥

গরজন সুবিকট
হইল সন্নিকট,
গো-মৃগ ঝট্ পট্
খুঁজে আড়াল।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড়
করিয়া তোড়-পাড়
পলায় দুদ্দাড়
মৃগের পাল॥ ১৫৬॥

চতুর্থ সর্গ

বিষাদপুর-প্রয়াণ

সূচনা

কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদপুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানা-প্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রাজা হাহাহূহূ গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

করিয়া জয়
মহা-প্রলয়,
বাজিয়া-উঠিল বাজনা নানা।
তাল-বেতাল
দি'চ্চে তাল,
থেই থেই নাচে পিশাচ-দানা॥
গাধায় চড়ি'
লাগায় ছড়ি
অদ্‌ভুত-রস কিম্পুরুষ।
দুটি অধরে
হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে-মানুষ॥ ১॥

বিড়াল-আঁখি,
আড়াল থাকি'
পলকে পলকে ঝলক্ মারে।
ছো'ট দু-খানি
চরণ-পাণি,
তাহা সে গাধা-টি বুঝিতে পারে॥
চলেছে গাধা,
না মানে বাধা,
সোয়ার পড়িয়া ভূঁয়ে লুটায়।
পেতিনী-মাসি
ঈষৎ হাসি'
"মরি মরি" বলি' ধরি' উঠায়॥ ২॥

কবি যথায়,
এ'ল তথায়,
নাচিতে নাচিতে লম্ফ মারে!
কতই ভানে
এ ও'র পানে
হাসিয়া হাসিয়া নয়ন ঠারে॥
কবির কাছে
দ্বিগুণ নাচে
বাজনায় করে কাণ-জখম।
তাল ফোটায়,
জ্ঞান ছোটায়,
হাব ভাব করে কত রকম॥ ৩॥

ক্ষণেক ধরি
এমনি করি'
কে কোথায় সবে সরিয়া-পড়ে!
অমনি সব
হ'ল-নীরব,
লতা-টি পাতা-টি না নড়ে-চড়ে॥
অবাক্-ছবি
দাঁড়ায় কবি,
কখন্ কি হয় ভাবি' আকুল।
আতঙ্গ-ভরে
অঙ্গ শিহরে,
কাঁটা-দিয়া-উঠে মাথার চুল॥ ৪॥

সম্মুখে দেখিল কবি তাকাইয়া,
মহাকায় আঁধার-মূরতি দুই, আছে দাঁড়াইয়া।
হাতে লাঠি-গাচ
যেন তাল-গাছ,
উচ্চে উঠিয়াছে শির বন ছাড়াইয়া॥ ৫॥

কবির পরাণ আর নাই ধড়ে,
দাঁতে দাঁতে উরতে উরতে ঠেকে, ঘুরিয়া বা পড়ে।
দাঁড়াইয়া-রয়
সে যেন সে নয়!
ইচ্ছা পলাইতে কিন্তু না নড়ে না চড়ে॥ ৬ ॥

কে কখন্ ধরিল তা' জানিল না।
ভাবে মাত্র জানিল, ধরে-নি হাত প্রেয়সী-ললনা!
চক্ষু রাঙাইয়া
মূর্ছা ভাঙাইয়া,
"দাঁড়াও" বলিল হাঁকি, দানব-দুজনা॥ ৭ ॥

"মানবের আস্পরধা এত বড়—
আধি-ব্যাধি-দানবে লঙ্ঘিয়া যায়! যদি নড়' চড়'
পা'বে যমলোক!
কা'র তুমি লোক
সত্য কহ!" কবিবর ভয়ে জড়-সড়॥ ৮ ॥

কবি কহে "কারো আমি লোক নই!
এদেশে আজিকে-মাত্র এস্যেছি, কভু না মিথ্যা কই!
কবি মোর নাম,
দেব-পুরে ধাম,
আর কিছু জানি না কবিত্ব-রস বই॥" ৯ ॥

ব্যাধি বলে রক্তবর্ণ করি' চোক,
"সত্য কও, হও কিম্বা নও তুমি প্রমোদের লোক!"
এত বলি' বাণী
হেঁচকিয়া টানি'
নিভ-নিভ করি তুলে প্রাণের আলোক॥ ১০ ॥

ব্যাধিরে কহিল আধি "রহ রহ!"
কবিরে কহিল "যদি বাঁচিবে যথার্থ-কথা কহ!"
কবিবর কয়
"বিচারে যা' হয়
শিরে করি' ল'ব তাই, কেন এ নিগ্রহ॥" ১১॥

আধি কহে "ক্ষীণ-জীবী নরাধম
এ'রে যমালয়ে দিলে উপহাস ঠাহরিবে যম।
ভূপতির ঠাঁই
লয়্যে চল যাই
এরে আজ!" ব্যাধি বলে "সেই সে উত্তম॥" ১২॥

পুনরায় আইল অদ্ভুত-দল;
"সঙ্গে যা'ব আমরা" বলিয়া সবে হাসিয়া বিহ্বল।
দূরে প্রেত যক্ষ
করে ঘোর লক্ষ,
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল॥ ১৩॥

ঝুপ্সি-ঝাপ্সি বন-আব্ডালে,
হাপ্সি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর-দিয়া ডালে।
কিম্ভূত-আকার,
অতি চমৎকার,
প্রকাশ-পাইয়া উঠে, জোনাক্-মশালে॥ ১৪॥

মানুষ কি জানোয়ার বুঝা ভার,
দুই ভাই দেখা-দিল সম্মুখে, কিম্ভূত-কিমাকার।
ওষ্ঠ-মাস ঠেলি'
দন্ত আছে মেলি';
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ-ধার॥ ১৫॥

ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্র, চমৎকার!
খরতর চাহনিতে হানিতেছে যেন তলবার!
"বাহবা" বলিয়া
জিহবা মেলিয়া,
হাত ধরিবারে যায় আকুল জনার॥ ১৬॥

"দূরে যাও" বলিয়া বিশাল শাল
উঁচাইল আধি-ব্যাধি-দানব, সাক্ষাৎ যেন কাল।
করি' ঘোর রব
ভাগে উপদ্রব;
বন্দি লয়্যে চলে দুই বন-দ্বার-পাল॥ ১৭॥

লোকালয়ে উত্তরিল কোন মতে;
যেথা-সেথা ভাঙা ঘর-দালান, নয়ন-মন ব্যথে।
গৃধিনী শৃগাল
চরে পালে-পাল,
গো মনুষ্য, কোথাও, দেখা না যায় পথে॥ ১৮॥

দেখা-দিল অদূরে বিষাদপুর;
ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া-উঠে শ্মশান-কুকুর।
আয়ু করি' ক্ষয়
দুষ্ট-বায়ু বয়,
দুঃসময় যেমন তেমনি ভারাতুর॥ ১৯॥

"কে এ'ল আবার" বলি' কণ্ঠে উঠি'
জ্বর-রোগী দাঁড়ায়, দুই-কপাটে দিয়া হস্ত-মুঠি।
গিয়া পুনরায়
পড়ে বিছানায়,
প্রলাপে কত কি বকে দন্ত ছরকুটি'॥ ২০॥

ডাকি'-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে;
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যা-ময় ঘোরে।
পড়িয়া বিপাকে
বাপ-মায়ে ডাকে;
ধড়-ফড় করে প্রাণ, সূক্ষ্ম এক ডোরে॥ ২১॥

রাত্রি আর কমে না, কেবলি বাড়ে!
ভোগীর এড়ায় হাত, রোগীর চাপিয়া-বসে ঘাড়ে।
দেখিলে দুর্বল
কে না করে বল!
বলবান্ নিরখিলে কে না পথ ছাড়ে! ২২॥

দেখা-দিল অট্টালিকা মহাকায়,
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙি', উচ্চ শিরে মহত্ত্ব শিখায়!
ভাঙা জানালায়
বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল পেচক থামের মাথায়॥ ২৩॥

আঁধারিয়া আছয়ে বন-বাদাড়;
আবড়া-খাবড়া ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ-ঝাড়।
নানা খানা-খন্দ
করে পথ বন্ধ,
দেখিলেই মনে-হয় দেশটি উজাড়॥ ২৪॥

ফাটকের দক্ষিণ কবাট ভগ্ন,
বামের কপাট-ভার একখানি কবজায় লগ্ন।
ভূতের চেহারা
দিতেছে পাহারা,
ক্ষীণ দেহ, চক্ষু দুটি কোটরে নিমগ্ন॥ ২৫॥

দৃক্-পাত না করিয়া দ্বার-পালে
কবিবরে পুরিল দানব-দোঁহে রাজ-সভা-শালে।
অদ্ভূতের দল
হাসি' খল্ খল্,
ছটকিয়া-পড়িল পাঁদাড়ে বিলে খালে॥ ২৬॥

হাঁ করিয়া আছয়ে প্রকাণ্ড ঘর;
জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, বলি 'সর্ সর্'!
দীপালোকে তায়
অর্ধ দেখা যায়
ভাঙা এক সিংহাসন ধূলায় ধূসর॥ ২৭॥

ছাড়-ভঙ্গ পড়ি'-আছে খান-কত
উঁচা-উঁচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।
বসিলেই পরে
নড়্ নড়্ করে,
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মতো॥ ২৮॥

আইল অদ্ভুত-রস, দল-সনে;
নেঙচিয়া চলি'-চলি' লাফ-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার
ঠিক নাই তার—
বসিলেন ঠেস্ দিয়া সহাস্য-বদনে! ২৯॥

বলিছে উল্লুক, "আমারি মুল্লুক!
খঞ্জনি বাজাও রে বিড়াল-ভায়া, নাচ রে ভল্লুক।
পাখী-হয়ে এস,
দলে আর মেশ'!
ঘিরি' বস' বাছা-সব, ছিরি বাহিরুক্!" ৩০॥

মূষিকে ধরিয়া, উদরে পূরিয়া,
মন্ত্রী আসি' বসিল পেচক-মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায়,
চঞ্চুটা গুঁচায়,
কাক সে অমনি বসে কিঞ্চিৎ সরিয়া॥ ৩১॥

সরিয়াই চারি-দিকে দৃষ্টি-ছাড়ে;
আকারের গতিকে মানুষ ভাল, বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে।
বাম-পার্শ্বে তা'র
বক অবতার,
পাকা চালে চলেন তাকান্ আড়ে আড়ে॥ ৩২॥

বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি'
ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়্গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া॥ ৩৩॥

হেন কালে দুপ্ দাপ্ ধুপ্ ধাপ্ ·
হইতে লাগিল সোপানের শব্দ, ভাঙিল বা ধাপ!
হুড়্ মুড়্ দাপে
বাড়ি-সুদ্ধ কাঁপে:
হাস্য-রব উঠে যেন শিবার বিলাপ॥ ৩৪॥

কাক গিয়া ডাক ছাড়ে, জানালায়;
ছাদে গিয়া নির্ব্বাদে, হাড়্গিলা থলিয়া ঝুলায়।
বক যায় খালে,
কাগাতোয়া ডালে,
থামে পেঁচা, অদভুত ছুটিয়া পালায়॥ ৩৫॥

হেন-কালে আইল বিষাদ-ভূপ.
হাহাহুহু-নামে খ্যাত, জাতিতে গন্ধর্ব একরূপ।
উষ্ক-খুষ্ক কেশ,
ঢিলা-ঢালা বেশ;
চক্ষু-দুটি হইয়াছে অন্ধকার-কূপ॥ ৩৬॥

যেমন প্রদেশ, তেমনি নরেশ!
সেই খেদে হা-হা হু-হু করিয়া, আসনে দেন ঠেস্।
চাহি' তা'র পরে
সচিবের পরে,
বলিলেন, "তুমি যেন ঠিক হৃষীকেশ॥ ৩৭॥

"বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লীন,
একরতি চেতন কেবল হয় বেতনের দিন!"
মন্ত্রী বলে "ভূপ,
বেতন কিরূপ
দু-চক্ষে না দেখিলাম বৎসরেক তিন॥" ৩৮॥

ভূপ বলে "সকলেই ক্ষীণ-জীবী,
তুমিই কেবল হইতেছ-দেখি মাংসের ঢিবি!
ছিলে শুধু অস্থি
হইয়াছ হস্তী;
বেতন পে'লে কি আর থাকিবে পৃথিবী?" ৩৯॥

নৃপই—সে সচিব, নৃপের দোষে!
মৃত্যু-হেতু এই অজাগরে, ভূপ, দুধ দিয়া পোষে।
লোক সে ধনাঢ্য,
নাম তা'র জাড্য;
চাপিয়া নৃপের কাঁধে কোষ-রক্ত শোষে॥ ৪০॥

বলে মন্ত্রী "মাংসের পর্বত-রাজ
বলিলেও টলি না! বোঝায় ভারি হইলে জাহাজ,
টলে না বাতাসে,
চলে অনায়াসে;
কিছু পাই না-পাই ভুলি-না আমি কাজ॥" ৪১॥

এই বলিয়াই, তুলিলেন হাই!
কুড়ি কুড়ি অমনি পড়িল তুড়ি, যুড়ি' সব ঠাঁই!
নৃপ বলে "আজ
নিরখিব কাজ!"
মন্ত্রী বলে "কোন কাজ অবশিষ্ট নাই॥ ৪২॥

"কাজের নাহিক আদি, নাহি শেষ!
যত করা-যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ!
হও তুমি রুক্ষ
তাহে নাই দুঃখ!
চাহিলেই দিব আমি কাজের নিকেশ॥ ৪৩॥

"গুপ্ত চর দু-জন পড়েছে ধরা;
ভূপ তুমি, তোমার উচিত হয় সুবিচার করা।"
বলে নর-পতি
"আন' দ্রুতগতি;
নিজ-হস্তে এবার শাসিব আমি ধরা॥" ৪৪॥

ক্ষণ-পরে জটা-জূট-ভস্ম-ধারী
ভণ্ড-তপ নামে এক অবধূত, ঘোর অহঙ্কারী;
সঙ্গে, হতভাগ্য
কপট-বৈরাগ্য
আইল এ দুই জন, সবে চমৎকারি'॥ ৪৫॥

আশিস করিল দান ভণ্ড-তপ;
কপট-বৈরাগ্য চেলা করিতে লাগিল মালা-জপ।
নৃপ বলে "কবে
জপ সাঙ্গ হ'বে?"
মন্ত্রী বলে "যখন হইবে শপাশপ!" ৪৬॥

"নারায়ণ! নারায়ণ!" বলে ভণ্ড;
মন্ত্রী বলে "দেখেছ ত আমায়, করিব খণ্ড-খণ্ড!"
বলে ভণ্ড-তপ
"করি তপ-জপ
রাজার কল্যাণ তরে. তেঁই এই দণ্ড!" ৪৭॥

নরপতি বলিল "বুজিয়া চোক
জপিছ কাহার নাম? হয়ে তুমি প্রমোদের লোক
বল' 'হরি হরি'?
কোথায় প্রহরী!"
মন্ত্রী বলে "উত্তম-মধ্যম রূপে হো'ক্॥" ৪৮॥

ভণ্ড-তপে এমনি কসায় বেত,
ধ্বনি শুনি' আড়ষ্ট হইয়া গেল যত ভূত প্রেত।
মন্ত্রী ঠারি' চোক
বলে "আরো হো'ক্!
বিশ-ত্রিশ না হইলে হইবে না চেত॥" ৪৯॥

বলিলেন কপট-বৈরাগ্য চেলা,
"দুষিব কাহারে আমি, এ ভবের এইরূপ খেলা।"
বলে মন্ত্রীবর
"এ'রে তা'র পর!
খেলা না ভাবেন যেন আপনার বেলা॥" ৫০॥

দম্ভ করি' বলি'-উঠে ভণ্ড-তপ
"বজ্র ঠেকাইতে-নারে কিবা ছত্র কিবা চন্দ্রাতপ!
বলিতেছি শুন'
এক দুই গুণ',
সহস্র না পের'তেই ঘুচিবে দরপ॥ ৫১॥

"সিংহাসন ধুলায় ধুসর হ'বে!
পশ্চিমে উঠিবে রবি, মোর বাক্য মিথ্যা হ'বে যবে!"
কপট-বৈরাগ্য
বলিল "সৌভাগ্য
অস্ত হইবার হ'লে সকলি সম্ভবে॥" ৫২॥

প্রহরী অমনি বলে "চুপ! চুপ!"
নৃপ বলে "ভণ্ড-দোঁহে দেখাও! দেখাও অন্ধকূপ!
তুমি গো সচিব
আছ কি সজীব?"
তন্দ্রা ভাঙি মন্ত্রী বলে "শুনিতেছি ভূপ!" ৫৩॥

কবি এতকাল আছিল আড়াল;
"জয় মহারাজের" বলিয়া দুই বন-দ্বারপাল—
আধি আর ব্যাধি—
বলে "অপরাধী
এ জন, বিচারকর্তা আপনি ভূপাল॥" ৫৪ ॥

মন্ত্রীবর বলিলেন "মহারাজ
পরিচয় লইতেছি; বল' বন্দি কি তোমার কাজ
এ সকল স্থানে?
কে তোমায় জানে?
সত্য যদি না বল', প্রলয় হ'বে আজ!" ৫৫ ॥

কবি কহে "ভুলিয়া দিক্ বিদিক্
পশিলাম অরণ্যে; জানি না কিছু ইহার অধিক!"
পরিহাসচ্ছলে
মন্ত্রীবর বলে
"দুধের ছাবাল তুমি! নিরীহ পথিক!" ৫৬ ॥

ভূপ বলে "সাবধানে কহ' কথা,
এ নহে অমরপুর—হেতাকার স্বতন্তর প্রথা!"
কবি কহে "ভূপ
কহিনু স্বরূপ,
বিচারুন কথা মোর যথা কি অযথা॥ ৫৭ ॥

"দেহ-প্রতি কিছু যা'র আছে স্নেহ,
পা বাড়ায় কভু কি তেমন বনে সচেতন কেহ?"
বলিলেন ভূপ
"করিছ বিদ্রূপ?
তুমি কা'র গুপ্তচর, নাহিক সন্দেহ!" ৫৮ ॥

দ্বারী বলে "মুখে দিব বস্ত্র গুঁজি',
কথা উচ্চারিলে;" মন্ত্রী বলিল "তলপি দেখ' খুঁজি'।"
অন্বেষণ-ফল
মিলিল কেবল
হাতের অঙ্গুরীয়ক সাথের যা' পুঁজি॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রী বলে "দিক্ ভুলিয়াছ বটে!"
এত বলি' অঙ্গুরি-টি হাতে করি', উলটে পালটে।
বলে "নাম লেখা
স্পষ্ট যায় দেখা!
উঁড়িবারে চাও তুমি আমার নিকটে! ৬০ ॥

"পথিকের এমনি-ই বটে সাজ!
অঙ্গুরিতে প্রমোদের নাম লেখা, দেখ' মহারাজ।"
চমকিয়া উঠি'
বলে ভূপ "ত্রুটি
হইয়াছে আমার একটি কাজে আজ॥ ৬১ ॥

"ভয়ানক-রস নর-বলি দিবে;
প্রয়োজন হইয়াছে তে'ই তা'র, বিষাদের জীবে।
পাঠাইয়া বন্দি
রাখা-চাই সন্ধি;"
এত বলি চুপি চুপি কহিল সচিবে॥ ৬২ ॥

"আধি-ব্যাধি দু-ভাই সতর্ক হয়ো
ভয়ানক-রসের পাতাল-দুর্গে বন্দি যা'ক্ লয়ো।
বলিবে 'বিষাদ
যাচয়ে প্রসাদ!'
শীঘ্র যাক্, সময় না যায় যেন বয়ো!" ৬৩ ॥

এত বলি' উঠিল বিষাদ-রায়;
ভণ্ড-তপে মন্ত্রিবর কহিলেন অল্প-ইসারায়
"মণির আশায়
ফণীর বাসায়
যে জন বাড়ায় হাত, পরাণ হারায়!" ৬৪ ॥

পলা'বার না দেখিয়া অন্য গতি
কপটেরে বলে ভণ্ড "গুরু-প্রতি করিস্ ভকতি!
(তপ-জপ-ধ্যান
মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্!)
হাসিয়া খেলিয়া তুই পাইবি মুকতি! ৬৫ ॥

"মনে জানি, ভক্তি তোর অতিশয়!
চক্ষে দেখিবার শুধু অবশিষ্ট, তা' হ'লেই হয়!
তো'র আমি কাজ
নিরখিব আজ!
পরীক্ষা উত্তরিলেই, তিন লোক জয়॥" ৬৬॥

এত বলি' চেলারে টানিয়া-লয়ে্য,
সচিবের কাণে কাণে আরম্ভিল, "একটুক রয়্যে
দিও মোরে দণ্ড!"
মন্ত্রী বলে "ভণ্ড!
পূর্বে সাধিলাম যবে, ছিলে মৌন হয়্যে! ৬৭॥

"এখন ফুটেছে মুখ! নষ্ট জীব!"
ভণ্ড বলে "চন্দ্র-শত"; "ইন্দ্র আন" বলিল সচিব—
"নেত্র সহস্রটি!"
বলে ভণ্ড জটী,
"চেলাটি আমার ইনি অতি শান্ত-শিব॥ ৬৮॥

"পুত্র-সম এ'রে আমি স্নেহ-করি;
উঠিবে মোহন্ত-পদে, লীলা আমি যে-দিন সম্বরি।
এ'রে বন্দি করি'
রাখ' তুমি ধরি',
নৈবেদ্য পাঠাই আমি স্বর্ণ-থালা ভরি'॥" ৬৯॥

মন্ত্রী বলে "তিনটি হাজার ঢাল'!"
ভণ্ড বলে "তথাস্তু"; সচিব বলে "কথা অতি ভাল!
তা'র মতো কাজ
শীঘ্র চাই আজ!
বন্দিরে বধিব, যদি প্রতিজ্ঞা না পাল'॥" ৭০॥

দেখি' শুনি' এই সব নষ্ট-পনা,
কবির মনের কথা মনে র'ল, বাহির হ'ল না!
ভগ্ন-ঘর-বাসী
চামচিকা আসি
ঘর-ময় করিতে-লাগিল আনাগনা॥ ৭১॥

সঙ্কটে পড়িল তায়, দীপ-আলো;
অন্ধকারে আলোকে বাধিল দ্বন্দ্ব, বিষম ঘোরালো!
পাখা-নাড়া-ঝাঁটে
পড়িয়া ঝঞ্ঝাটে,
আলোকের আয়ু যেন ফুরা'ল ফুরা'ল! ৭২॥

আলোকেরে কাবু করি', তা'র পর
সমূলে নাশিয়া তা'রে আঁধার যুড়িয়া-বসে ঘর।
সভাসদ্ যত
কে কোথায় গত!
"কি হয় না জানি পরে" ভাবে কবিবর॥ ৭৩॥

দীপ হস্তে-করিয়া বামন-ভূত
প্রথমে পশিল ঘরে, দেখিবারে অতি অদভুত!
কবি-মুখ-প্রতি
চাহি' একরতি,
উষ্কিল যেমন দীপ, বহিল মারুত॥ ৭৪॥

অমনি নিভিয়া-গেল দীপালোক!
তপত-অঙ্গার-সম আঁধি-ব্যাধি দানবের চোক
নীরব-ভাষায়
কবিরে শাসায়!
বলে যেন "খাড়া রও প্রমোদের লোক!" ৭৫॥

আঁধার-মূরতি দুই, অকাতরে,
কটির বন্ধন-বস্ত্র খুলিয়া বাঁধিল কবিবরে।
কবিবর তায়
মরম-ব্যথায়,
আহা-উহু করিয়া, অমনি চুপ করে॥ ৭৬॥

"চুপ রও!" বলে দুই দুষ্টাচার
"এখনি বেতের চোটে শিখাইব নম্র ব্যবহার!"
দু-হাত, কবির,
ধরি', দুই বীর,
কারাগারে পূরি' তা'রে, রুধিল দুয়ার॥ ৭৭॥

আধি-দৈত্য কপাট ধরিল দাবি';
ব্যাধি-দৈত্য লইয়া চাবির গোছা, দিল তা'তে চাবি।
পশিয়া সেথায়,
আইল কোথায়
ঠাহরিয়া কবিবর নাহি পায় ভাবি'॥ ৭৮॥

অতি উচ্চ প্রাচীরের উচ্চ দেশে,
জানালা দেখিয়া কবি, চাহিয়া-রহিল অনিমেষে!
আলোকের পথ
খুলিয়া ঈষৎ,
জ্যোৎস্না পড়েছে মারা, পদ-দ্বয় এস্যে॥ ৭৯॥

ঘোলা সেই আলোক আঁধার-গোলা,
কষ্টে সৃষ্টে নিরখিয়া, চলে কবি হয়্যে দিক্-ভোলা।
স্বভাব-চপল
মূষিকের দল
গায়ে লাফাইয়া-উঠে, লাঙ্গুল-তোলা॥ ৮০॥

গুরু হৈল অন্ধকার, ভয়-ভারে!
বসি'-পড়ে কবিবর শিরে হাত দিয়া একেবারে!
ফুটি'-উঠে বাণী
"মরিব তা' জানি,
দেখিতে নারিনু হায় প্রাণ-প্রতিমারে!" ৮১॥

উল্কা-হস্তে আধি দিল দরশন,
আচম্বিতে কবির নয়নে করি' আলো-বরিষণ।
জাঢল-মস্তক,
অতি ভয়ানক,
চাহনি মরম-ভেদী, রকত-শোষণ॥ ৮২॥

ব্যাধি-দৈত্য আইল ক্ষণেক পরে,
পলা'বার উদ্যোগ-করিল কবি পরাণের ডরে।
"উঠ' চল'" বলি'
দৈত্য মহাবলী
ধরিল কবির হাত, লৌহ-দলা করে॥ ৮৩॥

ভীষণ সে পথ, যার মধ্য দিয়া
কবিবরে ধরিয়া লইয়া-চলে অর্ধেক বাঁধিয়া!
আশা-ভরসায়
করিয়া বিদায়,
যাইতে লাগিল পথ পাতালে সেঁধিয়া॥ ৮৪ ॥

লয়ে-চলে কবিরে সাক্ষাৎ কাল
ব্যাধি-রূপী; আধি চলে আগে-আগে ধরিয়া মশাল!
পশে এইরূপে
ঘোর অন্ধকূপে;
ক্রমে ক্রমে গণ্ডভর হইল বিশাল॥ ৮৫ ॥

জন্তু কত রূপ, বিকট বিরূপ,
প্রকাণ্ড গুহার হেতা-হোতা বসি', করি' আছে চুপ।
কোথাও কুম্ভীর
হইয়া গম্ভীর,
একান্তে চাহিয়া আছে শিকার-লোলুপ॥ ৮৬ ॥

বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে;
ব্যাঘ্র-জিনি কোথাও কালো-বিড়াল, গরজিয়া ফুলে!
কোথাও বা রোষে
কাল-সর্প ফোঁসে;
হস্তি-কায় ভেক-পতি দুয়ার আগুলে॥ ৮৭ ॥

দেখি' দানা-দুটারে, যেমন, ক্ষোভ;
কবিবরে দেখিয়া, তেমনি হয় তা' সবার লোভ;
আধি-ব্যাধি-পাকে
সহ্য করি' থাকে,
ফণী রহে ফণা ধরি', নাহি মারে ছোব॥ ৮৮ ॥

সামনে জন্তুরা সবে পথ ছাড়ে;
আশে-পাশে তরজন-গরজনে, লাঙ্গুল আছাড়ে।
শ্লেষ্মাতুর বায়ু
হ্রাস করে আয়ু;
নাবে যত কবিবর, কাঁপে তত হাড়ে॥ ৮৯ ॥

মূরছিয়া পড়ে' আর, ঘড়ি ঘড়ি!
কত-মত ভীষণ মূরতি দেখি', কিম্বা মনে গড়ি'
যেমনি থমকে—
দৈত্যের ধমকে
রসাতল দিয়া-উঠে হুঙ্কার-দাবড়ি ॥ ৯০ ॥

পঞ্চম সর্গ

রসাতল-প্রয়াণ

সূচনা

জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভক্ত অনুচর আধি ব্যাধি কবিকে রসাতল-পতি ভয়ানক-রসের নিকটে সঁপিয়া দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে ভৈরব-নামক একজন করাল-মূর্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক-রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলিদান দিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা-দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে, এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে, উদ্ধার করিলেন।

গম্ভীর পাতাল! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়॥ ১॥

তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল!
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্!
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর॥ ২॥

আসে ফিরে্য! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমো-গর্ভে তলাইয়া শেষ-পৃষ্ঠে লভে শেষ গতি!
দল-বল একত্র করিছে হেতা রসাতল-পতি॥ ৩॥

কবির সর্বাঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
ভয়ানক-রসের দারুণ-কাণ্ড চক্ষে নেহারিয়া।
যত যেথাকার
বিকট আকার,
জড়ো হইয়াছে সবে আঁধার করিয়া॥ ৪॥

অত্যাচার-পিশাচ আছেন হেতা;
আছে মারী-নিশাচরী, দুর্ভিক্ষ অসুর-দল-নেতা।
দ্বেষ-হিংসা দানা,
দৈত্য আর নানা;
প্রতি-জন ভাবে "আমি ত্রিভুবন-জেতা" ॥ ৫ ॥

ভয়ানক, মাতি'-উঠে রণোৎসবে,
বলে "বিলাসের আজি দুই অস্থি একত্র না র'বে!"
দৈত্য, পালে-পাল,
খুলি' তরবাল,
অমনি বলিয়া-উঠে ভয়ঙ্কর রবে ॥ ৬ ॥

"এই তরবাল, প্রমোদের কাল!"
এত বলি' কোটি দৈত্য ওঁচাইয়া ঢাল-তরবাল,
ছাড়ে সিংহনাদ,—
পাতালের বাঁধ
ভাঙিয়া বা পড়ে খসি', এমনি করাল! ৭ ॥

মারী কহে "আমি ভয়ঙ্করী-নারী!
সজনে বিজন করি, পাইলে মুহূর্ত্ত দুই চারি!
চিতা-কুণ্ড জ্বালি'
মেদ-মজ্জা ঢালি',
করি যে কেমন হোম, জানে বজ্রধারী! ৮ ॥

ধিক্ দেবরাজে, ধিক্ তার বাজে!
দেবতা-সভায় মুখ-দেখায় না জানি কোন্ লাজে!"
বলে দুরভিক্ষ
"না রাখিব বৃক্ষ,
না পত্র না তৃণ এক, সসাগরা-মাঝে! ৯ ॥

"গগনের বাছারা পা'বেন টের!
বজ্রে তাঁরা বড় পটু! বজ্র-নাদ শুনা আছে ঢের!
জগতের শস্য
করি আগে নস্য!
বীর্য দেখা যা'বে পরে বজ্র-ধরেদের ॥ ১০ ॥

"অন্ন-বিনা স্বর্ণ-রূপ মাটি হ'বে!
শ্রমীর লাগিবে ভূমি! শিল্প-কাজ গল্প হয়ো র'বে!
প্রজা-নরপাল
হানিবে কপাল!
স্বর্গ-মর্ত্য জ্বলি'-যা'বে, হাহাকার-রবে॥" ১১॥

অত্যাচার বলে "এই তলবার
কোষে থাকিয়াই শোষে রুধির, এমনি দুর্নিবার!
এ যখন, শির
করেছে বাহির,
পৃথিবী করিবে আজি রক্ত-পারাবার॥ ১২॥

"করিয়াছি যখন সমর-সজ্জা,
পিশাচ খাওয়া'ব আজি, শুষি'-আনি' বিলাসের মজ্জা!
প্রমদা-যুবতী
কেমন সে সতী
দেখিব! দেখিব আজি কোথা রহে লজ্জা!" ১৩॥

দ্বেষ বলে, "একবার এই হাতে
পাই যদি প্রমোদেরে, চিবাই তাহারে আমি দাঁতে।
আছে সে কোথায়!
বড় সাধ যায়
মুকুট খসাই তা'র দুই পদাঘাতে! ১৪॥

"ইঙ্গিত করিলে-হয় দৈত্যরাজ!
ছার-খার করিব বিলাস-পুরী এই দণ্ডে আজ!
রাজদর্প নাশি'
রাণী-সবে দাসী
না যদি করিতে পারি, নামে নাই কাজ॥" ১৫॥

হিংসা বলে "শোন্ রে প্রমোদ-ভূপ!
তোর পৃষ্ঠে খনিবে এ মোর ছুরী রুধিরের কূপ!
কহিনু নির্ঘাত!
ক' দিন—ক' রাত—
দেখিব রহিস্ ঘরে আঁটিয়া কুলুপ॥ ১৬॥

"তো-সবারে সবংশে নিপাত করি',
প্রেত-ভূমি করিব আজিকে আমি বিলাস-নগরী।
বড় বড় লোক
ডরে মোর চোক!
ধূমকেতু দেখে মোরে দ্বারের প্রহরী! ১৭ ॥

"বড় সাজাইছ ফুল, থরে থরে!
রসনা লাড়িছে ফণী, লুকাইয়া তাহার ভিতরে!
ছুরী-খানি মাত্র
পরশিবে গাত্র,
বিলাস ঘুচিবে আর, জনমের তরে!" ১৮ ॥

বিষাদের দৈত্য-দুই মহাবলী
ভয়ানক-রসে নিবেদিল ভেট, হয়্যে কৃতাঞ্জলি।
হেন কার্য সাধি'
আধি আর ব্যাধি
প্রণমিয়া ভূপেরে, স্বস্থানে গেল চলি'॥ ১৯ ॥

ভয়ানক, কাঁপাইয়া কবিবরে,
মুখ-পানে তাকাইল ক্ষণেক; বলিল তা'র পরে,
"কোথা পুরোহিত!"
হয়্যে সশঙ্কিত
পুরোহিত দাঁড়ায় কম্পিত কলেবরে! ২০ ॥

পুরোহিতে বলে ভয়ানক-রস
"চামুণ্ডা-দেবীরে আহ্বান কর', মন্ত্রে করি' বশ।
নর-বলি-দান
কর সমাধান;
সমরে অমর হই, এ মোর মানস॥" ২১ ॥

"তথাস্তু" বলিয়া এক কাপালিক
কোথা-হৈতে আসি' উপস্থিত হ'ল! অযুত-অধিক
দানব দুর্দান্ত
গর্বে দিয়া ক্ষান্ত,
পথ ছাড়ি' দিল তারে, স্তব্ধ হ'ল দিক্! ২২ ॥

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ-মালা;
পিঙগল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা!
নমি' পদতলে,
ভয়ানক বলে,
"সকলের হর্তা-কর্তা তুমিই একালা!" ২৩ ॥

জটী বলে "আমি হ'ব পুরোহিত!"
তাল-বেতালেরে বলে "লয়্যে এ'স আমার সহিত
বন্দি এ মানবে;"
দুই সে দানবে
কবিরে ধরিয়া-লয়্যে হ'ল তিরোহিত॥ ২৪ ॥

কাপালিক, ভৈরব যাহার নাম,
কবিরে লইল আপনার হাতে, ছাড়াইয়া গ্রাম।
ভোগবতী-কূলে
অশ্বত্থের মূলে
রসি-দিয়া কসি' বাঁধে শরীর সুঠাম॥ ২৫ ॥

বন্ধন-জ্বালায় হয়্যে জর-জর,
পাশ মোড়া দেয় কবি, মাত্রা বাড়াইয়া পর-পর।
কষ্ট সে কেবল
নষ্ট করে বল,
ব্যথায় নয়ন-বারি ঝরে দর-দর॥ ২৬ ॥

বলে কবি "আর গো ভরসা নাই,
হে মায়া-জননি ডাকি তোমায়, চরণে দেও ঠাঁই!
অন্তিম সময়ে,
কোথা গো অভয়ে!
কাতর পরাণ মোর কাঁদিছে সদাই॥ ২৭ ॥

"পড়িয়াছি যে ঘোর দারুণ ফাঁদে
মরি তাহে দুঃখ নাই! সে জন্য তত না প্রাণ কাঁদে!
হৈনু যা'র লাগি
এ যন্ত্রণা-ভাগী,
দেখিতে-পেলেম না রে তা'র মুখ-চাঁদে! ২৮ ॥

"একবার দেখিতাম মুখ তোর,
মরিতাম মনোসুখে, সে ভাগ্য হ'ল না আর মোর!
মায়ের কৃপায়
এড়াইব দায়,
খেদ কিন্তু রয়ে়া-গেল এ-জনম-ভোর!" ২৯ ॥

সহজেই ভীষণ সে নাগ-লোক!
রবি-শশি-তারার নাহিক নাম! যে কিছু আলোক
চিতার অঙ্গার
করে উদগার,
আঁধার তাহাতে উঠে রাঙাইয়া চোক ॥ ৩০ ॥

শ্মশান-প্রদেশ তাহে নিদারুণ!
ঝাঁকে ঝাঁকে শৃগাল হাঁকিয়া-যায়, কাঁদি' সকরুণ!
বেগে জিনি বায়,
লোল জিহ্বায়
উল্কা-মুখী চলি'-যায় উগরি' আগুন ॥ ৩১ ॥

নদী-কূলে, শব্দ করি' কট্-মট্
শিবায় চিবায় শব, অস্থি করি' উলট্-পালট্।
অল্প পেয়ে চাড়
ভাঙি' পড়ে পাড়,
ছাড়ি' শব, ভাগে সব, ভাবিয়া সংকট ॥ ৩২ ॥

পাতি' এক শব, বসিল ভৈরব!
কপাল-করক ভরি' পুরা-মাত্রা লইয়া আসব,
সযতনে ধরি',
মন্ত্র-পূত করি',
একটি চুমুক-দানে নিঃশেষিল সব ॥ ৩৩ ॥

শবের সে বুকের উপরে চড়ি',
মুখে ঢালি'-দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।
ক্ষণে ক্ষণে শব
করে আর্ত্ত-রব;
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে়া, উঠে ধড়-মড়ি' ॥ ৩৪ ॥

ভৈরব করিতে-থাকে মন্ত্র-জপ;
মর-মর শবদ করিয়া-উঠে শ্মশান-পাদপ।
রহিয়া রহিয়া
মাঠ-মধ্য-দিয়া
আলেয়া চলিয়া-যায় করি' দপ্ দপ্॥ ৩৫॥

লোল জিহ্বা নাড়িছে বীভৎস-রস;
ঘোরিয়া-ঘোরিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস।
মৃত নাড়ি-ভুঁড়ি,
করে ছেঁড়াছিঁড়ি;
মেদ-রক্ত পান করে কলস-কলস॥ ৩৬॥

সাধকে ছলিতে-এ'ল বিভীষিকা;
মুখে ঝাঁপ-দিয়া পড়ে হইয়া বাদুড় চামচিকা।
হয়্যে এক কাক
ছাড়ি' যায় ডাক,
পায়ে সুড়-সুড়ি দেয় হইয়া মূষিকা॥ ৩৭॥

হয়্যে সিংহ নাড়িয়া-বেড়ায় জটা;
থমকিয়া হাই তুলে, পরকাশি' দশনের ছটা!
কভু হয়্যে বাঘ
করে তাগ-বাগ,
আরম্ভে তাহার পর গরজন-ঘটা॥ ৩৮॥

তখন সে কাপালিক, নষ্ট লোক,
বেতালেরে ইঙ্গিতিল "নর-বলি উপস্থিত হো'ক্।"
ডাকি' বলে পুন'
"শুন! শুন! শুন!
নড়িও না, যতক্ষণ পড়ি আমি শ্লোক॥" ৩৯॥

"জয় দেবি ভয়ঙ্করী!
নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!

ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা!
দিগম্বর-বুকে দু-পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল-স্থল-রসাতল
পদ-ভরে টলমল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল,
বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহ-নাদ পলকে-পলকে! ৪০॥

"রক্তে-রক্ত মহা-মহী!
রক্ত ঝরে অসি বহি'!
রক্ত-ময় খাঁড়া লক-লকে!
লোল জিহ্বা রক্ত-ভুখে!
ক্ষত অঙ্গ শত-মুখে
রক্ত বমে ঝলকে ঝলকে।
উর' কালি কপালিনী!
উর' দেবি করালিনী!
নরবলি ধর' উপহার!
উর' জলধর-নিভা!
উর' লক-লক-জিভা!
পুর' বাঞ্ছা সাধক-জনার॥" ৪১॥

রম্ ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে!
ভূত-প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, যোড় কর-পুটে!
আইল কালিকা
কপাল-মালিকা,
বস্ত্র-মেঘে, রক্ত-জিভা, সন্ধ্যা-রাগে ফুটে॥ ৪২॥

বিলসিছে বিশদ রদন-পাঁতি,
রজত বিজলি যেন খণ্ডিতেছে অন্ধকার-রাতি।
কাল-রাত্রি-ভীমা
মুখের প্রতিমা,
নয়ন-রক্তিমা তাহে অরুণের ভাতি॥ ৪৩॥

ঘোর বিপদ হেতায়
কবির মাথায়
পড়ে পড়ে, মায়া-মায়ে ডাকে কাতর-প্রাণী।
“এ যে পিশাচের ভূমি!
কোথা গো মা তুমি!
কা'র কাছে কাঁদিব! কে শুনে কাহার বাণী! ৪৪॥

“ডাকি তোমায় হে মায়া
দেও পদ-ছায়া!
রসাতলে পড়্যে-আছি হয়্যে চেতন-হারা!
আর কাহ'কে জানি না
কভু, তোমা-বিনা;
তুমি মোর অকূল পাথারে অচল-তারা॥ ৪৫॥

“দেহ তেয়াগিয়া যাই
তাহে দুখ নাই!
কাঁদি কেবল, ধরিবার লাগি চরণ-তরী।
সেই স্নেহের বদন
অভয়-সদন,
একটিবার দেখাও জননি, দেখিয়া মরি!” ৪৬॥

নিরখিল সম্মুখে অবাক্ মানি'
কৃপাময়ী মূরতি! ভাবিল কবি সাক্ষাৎ ভবানী।
বাহন নধর
নব-জলধর,
পশু না পক্ষী না, পাছে ক্লেশ পায় প্রাণী॥ ৪৭॥

জ্যোতির্ম্ময়ী, ম্লান কিন্তু মুখাভাস।
গালে হাত-দিয়া বসি', ফেলিছেন আকুল-নিশ্বাস।
আছেন আছেন—
নয়ন মোছেন!
করুণা ইঁহার নাম ত্রিদিবে নিবাস॥ ৪৮॥

বলিল করুণা-দেবী "বৎস মোর,
আর তোরে বাঁধিতে না পারে কভু দৈত্য-দানা ঘোর—
কু-গ্রহ না চাহে,
সন্তাপ না দাহে,
হাতে তোর বাঁধি' দিনু এই রাখী-ডোর॥" ৪৯॥

এত বলি' হরি'-লয়ে দুঃখ-শোক,
আঁখির বরষা-মাঝে বিতরিয়া ভরসা-আলোক;
বাঁধি'-দিল রাখী;
বন্দি-সহ শাখী
এড়াইল অমনি কাপালিকের চোক॥ ৫০॥

না দেখিয়া সে বন্দি, না সে অশ্বথ,
বেতালে ডাকিয়া-বলে কাপালিক ভগ্ন-মনোরথ
"কোন্ দুষ্ট, আজ,
করিল এ কাজ!
বন্দির ত রাখি নাই, পলা'বার পথ! ৫১॥

"কেন দেবি সেবকে হইল রোষ!
কেন দেবি চামুণ্ডে, নৃ-মুণ্ডে আজি হইল না তোষ!
করো না ভ্রূকুটি!
হয়ে-থাকে ত্রুটি,
এখনি বিধান-মতে খণ্ডিতেছি দোষ!" ৫২॥

মহামাংস প্রসাদ পাইবে বলি'
ডাকিনী যোগিনী সবে নাচিতেছে আনন্দে উথলি;
নিরখিল যেই
নরবলি নেই,
ক্রোধ-রক্ত নয়নে আগুন উঠে জ্বলি'॥ ৫৩॥

হুহুঙ্কারে জিনিয়া প্রলয়-বায়
ধেয়ে এ'ল তারা যেই, কাপালিক উঠিয়া-পলায়।
লোল-জিহ্বায়
তা'রা পিছু ধায়,
"দে বলি দে বলি" বলি', ক্ষুধার জ্বালায়॥ ৫৪॥

কপালিনী ঢাকিল তখন কায়া;
আঁধার-নিশীথে মিশাইয়া-গেল জলধর-চ্ছায়া!
ছিল কবিবর
বন্ধ-কলেবর
মুক্ত হ'ল অমনি, এমনি দৈব-মায়া! ৫৫ ॥

এতকাল হয়ে ছিল নিরুপায়;
বন্ধন যেমন ঘুচে, মৃত-দেহে প্রাণ যেন পায়।
"নমি গো বরদে
কাণ্ডারী বিপদে!"
হেন বলি' নমে গিয়া করুণার পায় ॥ ৫৬ ॥

বলিলেন করুণা "বৎস আমার!
আসিয়াছি স্বর্গ-হ'তে ঘুচাইতে যন্ত্রণা তোমার!
উঠ! বর মাগো!"
কবি কহে "মা গো
মনে-রেখ্যো দাসেরে, চাহি না কিছু আর!" ৫৭ ॥

বলে দেবী কবিরে "যেখানে থাক',
জননী তোমার আমি চির-দিন, ডাক' বা না-ডাক'।
যাহার লাগিয়া
গৃহ তেয়াগিয়া
ফিরিছ এমন করি', কেন তাহা ঢাক'?" ৫৮ ॥

কহে কবি "দেবী তুমি, তোমা-কাছে
মুখে কি বলিব আর, আঁখি তব কোথায় না আছে!
মোর চিত্ত-পট
এ নহে কপট,
দেখ' মা প্রতিমা কা'র লেখা রহিয়াছে!" ৫৯ ॥

বলে দেবী "ঘুচিবে সকল ক্লেশ,
পূর্ণ হ'বে অভিলাষ, বিভাবরী না হইতে শেষ!
আইস এখন!"
বলে ভক্ত-জন,
"মাথার মুকুট মোর তোমার আদেশ!" ৬০ ॥

করুণার পাছু পাছু কবিবর
চলিল রাখী'র গুণে হইয়া অদৃশ্য-কলেবর।
কম্পিত-শরীরে
নামি' ধীরে ধীরে,
পশিল ক্ষণেক-পরে বিশাল গহ্বর॥ ৬১॥

মায়া-গুণে অদৃশ্য, দুদণ্ড-কাল
দাঁড়াইল যেমন, অমনি এক মূর্তিমান্ কাল
প্রবেশিল তথি!
ভীম সে মূরতি
অত্যাচারী! হস্তে এক প্রকাণ্ড মশাল॥ ৬২॥

গুহা-গহ্বরের, কোথা এক টের,
সেথায় চলিল দৈত্য, বক্র-পথে করি' ঘোর-ফের।
ক্ষণেকে মশাল
হইল আড়াল,
কবির চৌদিকে দিয়া আঁধারের ঘের॥ ৬৩॥

ক্রন্দনের মত এক তার-ধ্বনি
পশিল কবির কাণে, প্রাণে যেন বাজিল অশনি।
মৃদু অবলার
মধুর গলার
আইল সে আর্তনাদ ভেদিয়া রজনী॥ ৬৪॥

আড়ষ্ট হইয়া কবি, কাণ পাতে;
আশঙ্কা জাগিয়া-উঠি' কত-শত মন্ত্র দেয় তা'তে।
কখনো এগোয়
কখনো পিছোয়,
কখনো সম্মুখে চায়, কখনো পশ্চাতে॥ ৬৫॥

কাঁপিতে কাঁপিতে হয়ে অগ্রসর,
মশালের আলোকে নিরখে কবি অতি ভয়ঙ্কর
দারুণ ব্যাপার!
প্রমদা-বালার
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, যোড় দুটি কর॥৬৬॥

দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ-কায়
অত্যাচার নামে দৈত্য; দুই চক্ষু জবা-ফুল প্রায়
কাদম্বরী-পানে;
প্রমদার পানে
সতৃষ্ণ নয়ন-পাতে প্রেম-ভিক্ষা চায়॥ ৬৭॥

বলে দৈত্য "যুদ্ধে যাইতেছি আমি;
জানিস্ ত কে-সে ভয়ানক-রস রসাতল-স্বামী
যে তোরে হেথায়
রাখিবারে চায়?
হো'স্ যদি আমার, বাঁচা'ব তোরে আমি॥ ৬৮॥

"আমার বচন যদি মনে-ধরে,
এই ঠাঁই যেমন আছিস্ থাক্, দুদিনের তরে।
রণ সাঙ্গ হ'লে
তোরে লয়ে কোলে
যাইব সমুদ্র-পার, আর কে কি করে॥" ৬৯॥

বলে ধনী "ফেলিয়া-এসেছি বাপে
ঘোর কারাগারে, দহিতেছি সেই দারুণ-সন্তাপে!
ক্ষম' দৈত্য-রাজ!
নিদারুণ বাজ
তোমার বচন ও যে, শুনি' অঙ্গ কাঁপে!" ৭০॥

বলে দৈত্য "হিত বাক্য হ'ল বাজ!
আমায় ত্যজিয়া তুই ভজিবি কি রসাতল-রাজ—
বিশ্ব যা'রে ডরে?
প'লে তা'র করে,
আগেই খোয়া'তে হ'বে কুল-মান-লাজ॥ ৭১॥

"এখন সৈন্যের হ'ব অনুগামী।
সমর হইলে শেষ, সিন্ধু-পারে লয়ে তোরে আমি
পাতিব সংসার;
তোর সে পিতার
বন্ধন ঘুচা'ব পরে, এবে থাক্ থামি'॥" ৭২॥

প্রমদা বলিল অশ্রু-জলে ভাসি',
"দৈত্য হয়ে এত যদি তুমি মোর হিত-অভিলাষী,
এই ভিক্ষা দেহ,—
নাহি মোর কেহ
পিতা-বিনা, তাঁর সঙ্গে হই কারাবাসী॥ ৭৩॥

"নহিলে তোমার দুটি পদে আজ
ত্যজিব নারী-জীবন! নির্ভয়ে ভজিব যম-রাজ,
অধর্মে না তবু
মন দিব কভু!
গেল যদি ধরম, জীবনে কিবা কাজ॥" ৭৪॥

বলে দৈত্য বলী, "তুমি যাও চলি'—
আমি-মূঢ় হাত-পা আছাড়ি আর মনাগুনে জ্বলি!
চক্ষে ধারা-জল,
বক্ষে হলাহল!
পেয়েছিস্ মোরে যেন ননীর পুথলী! ৭৫॥

"চক্ষু-জলে আমায় গলা'বি তুই!
রাশি-রাশি অমন চক্ষের জলে কত-যে পা ধুই,
তা' তুই জানিস্!
আমি কি শিরীষ-
ফুলটির মতন যে ফুঁ-দিলেই নুই? ৭৬॥

"রাজ্য চা'স্? বিপুল ঐশ্বর্য চা'স্?
কি চা'স্ আমায় বল্—পূরাইব সব অভিলাষ!
কত রত্ন-রাশি,
কত দাস-দাসী,
চাহিস্! আপনি হ'ব আজ্ঞাকারী দাস!" ৭৭॥

প্রমদা বলিল "এত যন্ত্রণা গা
আমার কপালে ছিল! যত্নে বাঁধি'-রাখিবার তাগা
সতীত্ব ধরম—
তুই রে অধম
তাহাতে চাহিস্ দিতে কলঙ্কের দাগা! ৭৮॥

"মন তোর বুঝিবে না, কি বুঝা'ব!
পাষাণ-পরাণ তোর অশ্রু-জলে কেমনে ভিজা'ব!
কৃতান্তও নয়
এমন নির্দয়!
বিপদ-কাণ্ডারী সেই, তা'রি ঠাঁই যা'ব!" ৭৯ ॥

"হুঁ!" বলিয়া চাহে দৈত্য খট্‌মট্‌।
শেষে বলে "কোথা তোরা দু-বো'ন, চলিয়া-আয় ঝট্‌!"
কোথা এক কোণে
ছিল দুই বো'নে,
পলক-মাঝারে দোঁহে হইল নিকট॥ ৮০ ॥

ঈরিষা-বড়াই-নামে দুই বুড়ি,
নড়ি-হাতে প্রমদার নিকটে আসিয়া গুড়ি-গুড়ি
সমুখা-সমুখি
দাঁড়াইল ঝুঁকি',
নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফুঁড়ি'! ৮১ ॥

চিবায়ে কড়াই, বলিছে বড়াই,
"হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক, ফুঁয়ে আমি পর্বত নড়াই!"
পড়িয়া সরিষা
বলিছে ঈরিষা
"হাসি-মুখ যত আছে পুড়ি' হো'ক্ ছাই!" ৮২ ॥

কাঁপিতে-লাগিল ভয়ে অনাথিনী;
বলিল বড়াই-বুড়ি "হও যাও রাজার সাথিনী!
তোমার বয়সী
রাজার মহিষী
যে আসে—আমায় বাসে প্রধান মন্ত্রিণী! ৮৩ ॥

"আমি যা'রে সন্ধান দিয়াছি বলি',
বুক-ফুলাইয়া যায় রাজার সমুখ-দিয়া চলি'!
নূতন আনাড়ি
গেলে রাজ-বাড়ি,
তরাসে হইয়া-রহে আড়ষ্ট পুথলী!" ৮৪ ॥

শুনি' কহে ঈরিষা "গরব ঘুচে
পড়িলে তেমন হাতে! রাজার সোহাগ নাহি রুচে—
মরি কি রূপসী!
পথে-ঘাটে বসি'
কাঁদিছে অমন-কত, কেহ নাহি পুছে! ৮৫॥

"সাধিতেই অমনি বাড়িল বুক!
উনি সতী, মোরা সবে অসতী! সতীত্বে দিই থুক্!"
শুনি' রূপসীর
পা হইতে শির
শিহরিয়া উঠিল, শুখায়ে-গেল মুখ॥ ৮৬॥

নিরখিয়া ডাইনীর মুখ নাক,
শুনিয়া কথার ধারা, প্রমদার নাহি সরে বাক্!
কম্প এ'ল ধড়ে!
মূর্ছিয়া বা পড়ে!
বড়াই অমনি বলে ছাড়ি' এক ডাক! ৮৭॥

"ভাবিয়াছ আমায় বুড়ি-থুত্থুড়ি!
স্বর্গে মর্ত্যে প্রলয় বাধিয়া-যায়, দিই যদি তুড়ি।
মাড়ি এই মোর
ধরে এত জোর,
চিবাইয়া ভাঙি আমি পাথরের নুড়ি! ৮৮॥

"এই হাড়ে আমি ভেলকি খেলাই!
এই ত চিম্‌সা হাত, এই হাতে পৃথিবী টলাই!"
ঈরিষা জ্বলিয়া
উঠিল বলিয়া
"জমিছে বকুনি শুনি', শকুনি মেলা-ই! ৮৯॥

"বকি' বকি' মুখে উঠিয়াছে গেঁজ!
মনে মনে হাসিছে ও গরবিনী, দেখি' তোর তেজ!
বিষ নাই কণা,
কুলো-পানা ফণা!
সমর্থ মেয়ের ও'তে মোটা হয় লেজ!" ৯০॥

বড়াই বলিল, "তোর বড় হই,
আমায় ঘুরা'স্ চোক! আর আমি হেতায় না রই!
মোরে, ও-রে রিষ,
দিদি না বলিস্,
দে'তো-মুখ আজি তোর না যদি থে'তই!" ৯১॥

এত বলি' গুঁড়ি-মারে অন্ধকারে,
দু-চারি পা এগোয়, পিছনে আর ফিরিয়া নেহারে!
বিড়-বিড় বকি',
নড়ি ঠক্-ঠকি',
ক্রমে তবে প'হুছায় কোটরের দ্বারে॥ ৯২॥

দ্বার-হৈতে নামিতে সিঁড়ির ধাপে,
হোঁচট্ খাইয়া পড়ি', ঈরিষারে ডুবাইল শাঁপে—
"শিশু-রক্ত-খাকী!
বিষ-ভরা আঁখি!
মোরে তুই গালি দিস্, গা তোর না কাঁপে! ৯৩॥

"এই দ্যাখ্ হাতের নড়ির গুণ!
বাতাসে কি দাগে দ্যাখ্! এই তোর কপালে আগুন!
কালো ঘুর্ঘুর্যো
বুক খা'বে কুর্যো!
শকুন, শিয়রে বসি', বাছিবে উকুন!" ৯৪॥

প্রমদারে বলিছে ঈরিষা-বুড়ি,
"যা'বে লো শ্বশুর-বাড়ি, হাতে পরাইয়া-দিই চুড়ি!
যা'বে প্রিয়-কাছে—
কাঁদিতে কি আছে!
নড়িলে, ভাঙিব হাত, মুচুড়ি' মুচুড়ি'!" ৯৫॥

এত বলি' পরাইল হাতকড়ি;
ব্যথায়, প্রমদা-বালা, ধরাতলে লুটাইয়া-পড়ি'
সব দেখে ফাঁকা;
আগুনের ছাঁকা
দিল যেই ঈরিষা, উঠিল ধড়মড়ি'॥ ৯৬॥

দৈত্য কহে "আজিকে এই অবধি!
রণ-হৈতে ফিরি'-আসি আমি আগে, শত্রু-দলে বধি',-
শুনে যদি বাণী
হ'বে রাজা-রাণী,
না শুনিলে বিনাশিব দগধি' দগধি'॥" ৯৭॥

যুদ্ধে গেল দানব সে নিরদয়;
ঈরিষা কোটরে গেল; দেখি' সব অন্ধকার-ময়
কাঁদিছে প্রমদা
"কোথা মা বরদা!
কোথা মা করুণা-ময়ী এমন সময়!" ৯৮॥

মেঘ-যানে করুণা দিলেন দেখা
প্রমদার নয়নে; জলদাসনে যেন চন্দ্র-লেখা;
অথবা এমনি
স্থির-সৌদামিনী—
নিকষ-পাষাণে যেন সুবর্ণের রেখা! ৯৯॥

আশ্চরিজ হইয়া প্রমদা কয়
"কোন্ কৃপাময়ী দেবী হরিতে আইলে মোর ভয়
এ দারুণ স্থানে!
ভয় হয় প্রাণে—
মন যা' বলিছে মোর, মিথ্যা পাছে হয়॥ ১০০॥

"সত্য করি' বল' মোরে, কে তুমি মা!
পড়িয়া দৈত্যের হাতে, নাহি মোর যন্ত্রণার সীমা!"
শুনি' দেবী কয়
"কে হেন নির্দয়—
লোহার খনিতে রাখে সোনার প্রতিমা! ১০১॥

"ও-যে রূপ, স্বর্গ-ধামে সাজে ভাল!
কে'দ' না! পালিবে ধর্ম তোমায়, ধর্মে যখন পাল'!
কান্না শুনি' আমি
আসিয়াছি নামি'!
বর-তনু-পরশে কর-সে রথ আলো॥" ১০২॥

এত বলি' প্রমদারে ধরি'-তোলে
নবীন-নীরদ-রথে; পরে তা'রে বসাইয়া কোলে
মুছে অশ্রু-বারি;
প্রমদা-কুমারী
পরাণ পাইয়া-উঠে স্নেহের হিল্লোলে ॥ ১০৩ ॥

বলে বালা "অভাগীর দুখানলে
বরষিলে শান্তি-বারি, নমি মা তোমার পদতলে!"
বলি' হেন বাণী,
কাতর-পরাণী
পাদ-পদ্ম ভাসাইল নয়নের জলে ॥ ১০৪ ॥

বলে বালা "কে আছে গো তোমা-সম
সন্তাপ-হারিণী মাতা! সকল ভরসা তুমি মম!
দাসীরে আশিস'!
প্রসাদ বরিষ'!
অভয়-চরণ-তলে নমো-নমো-নম ॥" ১০৫ ॥

কৃপাময়ী বলিল, "আর কেঁদ' না!
আশিসিনু তোমায়, পেয়েছ তুমি যেমন বেদনা,
শত-গুণ তা'র
পাবে পুরস্কার!"
এত বলি' প্রমদারে করিল সান্ত্বনা ॥ ১০৬ ॥

কবিরে বলিল দেবী "দেব-দেবে
প্রণমিয়া, এ'স জলদের পিছু; তাঁহারে যে সেবে,
ভয় নাই অণু
সে জনার; তনু
অদৃশ্য আছে তোমার, দৃশ্য হোক্ এবে ॥" ১০৭ ॥

চলে কবি রথের পশ্চাৎভাগে;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা-গহ্বর দেখি' ডর লাগে!
দেখে নদী-নদ,
কোথাও বা হ্রদ,
কিন্তু না দেখিতে পায় গেছে কোন্-বাগে ॥ ১০৮ ॥

দেখা-দিল অদূরে পন্নগ-ধাম!
আকাশ-পাতাল যুড়ি', উঠিয়াছে ধাতুময় থাম!
মহা-আয়তন
দিব্য-নিকেতন,
রতনে-রতন-ময় মনো-অভিরাম॥ ১০৯॥

কোটি রত্ন বিলসিছে, কোটি রাগে!
পাতালে এমন স্থান—কবিবরে চমৎকার লাগে!
সকলি নিস্তব্ধ!
নাহি সাড়া শব্দ!
জলের কল্লোল-ধ্বনি শুনা-যায় আগে॥ ১১০॥

পদ-শব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির!
শ্রবণ-প্রবণ
গহ্বর-ভবন,
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির॥ ১১১॥

টুঁ-শব্দ-টি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্, করি' কাড়াকাড়ি।
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
জাগিয়া অমনি,
অল্প-সূত্রে করি'-তুলে মহা বাড়াবাড়ি॥ ১১২॥

অবাকিয়া দেখিল কল্পনা-প্রিয়,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া-চলিয়াছে হর্ম্য রমণীয়।
রত্ন-দীপ জ্বালা,
সুনিভৃত শালা;
গাইতেছে নাগ-বধূ, ঢালিছে অমিয়॥ ১১৩॥

কবির শুনিল যেই পদ-শব্দ
দাঁড়াইল অমনি নাগিনী-সবে হইয়া নিস্তব্ধ;
হেরিয়া যুবক
লাগিল চমক;
স্বপ্ন-মাঝে চেতন হইল যেন লব্ধ॥ ১১৪॥

সারি-সারি যতেক নাগিনী-দল
করুণার পাদ-পদ্মে প্রণমিল; প্রেম-অশ্রু-জল
নয়নে সবার
ঝরে অনিবার;
বলে "এত দিনে হল জনম সফল॥" ১১৫॥

এই-রূপ নানা দৃশ্য নেহারিয়া,
মেঘ-যানে চলে দেবী রসাতল পশ্চাতে করিয়া।
ক্রমে কথাচ্ছলে
প্রমদারে বলে,
"কেন হ'ল হেন দশা কহ বিবরিয়া॥" ১১৬॥

কহে বালা "যে অনলে মোর প্রাণ
জ্বলিতেছে দিবা-নিশি, বলি যদি গলিবে পাষাণ।"
নয়ন-যুগল
করি' ছল্ ছল্,
কাঁদো-কাঁদো হয়ে-এ'ল কমল-বয়ান॥ ১১৭॥

বসনের আঁচল লইয়া টানি',
মুছিয়া নয়ন-দুটি, আরম্ভিল কোমল-পরাণী।
আগে আধো-আধো,
যেন বাধো-বাধো,
ক্রমে সামালিয়া ব্যথা, ফুটি'-কহে বাণী॥ ১১৮॥

"মলয়-পুরের যিনি নরপাল,
নাম ঋতু-রাজ, তাঁর কন্যা হয়ে হইলাম কাল।
পুষ্পিত কাননে
বন্ধু-জন সনে
আমোদ-প্রসঙ্গে পিতা যাপিতেন কাল॥ ১১৯॥

"তাপ-নামে প্রজা এক ছিল তাঁর;
আমা-পানে করিল কুদৃষ্টি-পাত, সেই দুরাচার।
পিতা তা'রে ডাকি'
বলিলেন হাঁকি',
'ছাড়' দেশ! তোমায় দেখি না যেন আর!' ১২০॥

"মরু-পুর নামে এক, আছে দেশ;
সেই ঠাঁই গিয়া তাপ সেথাকার হইল নরেশ।
চাহিল আমারে
রাণী-করিবারে,
পিতার তা রুচিল না; তেঁই তা'র দ্বেষ॥ ১২১॥

"এক-দিন লইয়া সৈন্য-সামন্ত,
আক্রমিল আসিয়া পিতার পুরী, অরি সে দুরন্ত।
করিল যে-কার্য—
গেল সব রাজ্য
তা'র হাতে, সপ্তাহেক না হইতে অন্ত॥ ১২২॥

"কারাগারে পিতারে করিল বন্দি,
অন্তঃপুরে আমায়; কি ক'ব তা'র নষ্ট অভিসন্ধি,—
ঘোর রাত্রি-বেলা
আইল একেলা;
বলিল 'এস্যেছি আমি করিবারে সন্ধি॥ ১২৩॥

" 'প্রেম-দানে আমায় শীতল কর্;
পিতা তোর নিরাপদে যা'ক্ চলি', দেশ-দেশান্তর;
নৈলে তোর পিতা,
না জ্বলিতে চিতা,
শৃগালের কুকুরের পুরা'বে উদর॥' ১২৪॥

"আমি বলিলাম 'এত নিরদয়
হয়্যো না আমার প্রতি; জ্বলিতেছে আমার হৃদয়,
দাবানল যথা;
না জুড়া'লে ব্যথা
কেমনে হইবে তা'তে প্রেমের উদয়॥' ১২৫॥

"বলে দৈত্য 'দিবস দিলাম ত্রিশ
মন করিবারে শান্ত; এক মাত্র ভরসা জানিস্
আমার সন্তোষ;—
বাঁদী বই নোস্!'
এত বলি' গেল চলি' দুচক্ষের বিষ॥ ১২৬॥

"স্মরিলে তা' এখনো হৃদয় কাঁপে!
ভাবিয়া হইনু সারা 'কেমনে এড়াই মহাপাপে!
কায়া-মায়া ত্যজি
যমে যদি ভজি,
রাখিবে না পামর তা' হ'লে মোর বাপে॥' ১২৭॥

"মরিবারে সাধ, তাহাতেও বাদ
সাধিল যখন বিধি; শিলা-ভার এমনি, বিষাদ,
চাপাইল বক্ষে—
অনিমিখ চক্ষে
পোহায় না দুখ-নিশি, করি আর্তনাদ! ১২৮॥

"হইয়া-উঠিনু যেন উনমাদ!
আচম্বিতে এক-দিন শুনিলাম যুদ্ধের নিনাদ।
অসির ঝঙ্কারে,
বীরের হুঙ্কারে,
মনে-হ'ল শমনের বেড়েছে আহ্লাদ॥ ১২৯॥

"ভাবিলাম 'বিধি বুঝি সকরুণ!
তাপ-বংশ হো'ক ধ্বংস! হো'ক যুদ্ধ! জ্বলুক আগুন!'
কাঁপি' কাঁপি' ডরে,
দেখিলাম পরে,
আসিতেছে দুইজন দৈত্য নিদারুণ॥ ১৩০॥

"জয়-রবে কর্ণ-পাতি' জানিলাম,
ভয়ানক-রস রাজাধিরাজ এক-জনের নাম;
অন্য সে জনার
নাম অত্যাচার;
তখন বুঝিনু আমি, বিধি মোরে বাম॥ ১৩১॥

"অত্যাচারে বলিল সে দৈত্য-রাজ,
'আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি এবে কর' এই কাজ—
রাজার বেটীরে
আঁধার কুটীরে
লয়ে-যাও; সে যুবতী মোর হ'বে আজ॥' ১৩২॥

"এইরূপ কথোপকথন-মাঝে;
করাল-পর্জন্য-নামে দৈত্য এক, সমরের সাজে
আসি' দ্রুত-গতি,
করিয়া প্রণতি
বলিল 'কি আর দিব রসাতল-রাজে—১৩৩॥

" 'অরি-মুণ্ড লও এই মহারাজ!
এ মুণ্ড তাপ-রাজার, নাই এবে মুকুটের সাজ।'
রসাতল-পতি
হয়্যে হৃষ্ট-মতি
বলিল 'ইহারি মধ্যে করিয়াছ কাজ! ১৩৪॥

" 'উত্তম! পাইবে তুমি পুরস্কার!
আপাতত' এই লও, এ'র নাম তড়িৎ-বিহার!
এ যবে বিলসে,
নয়ন ঝলসে!'
এত বলি' দিল এক অসি চমৎকার॥ ১৩৫॥

"ক্ষণ-পরে পশিয়া আমার ঘরে
অত্যাচারে বলিল 'এ যুবতীরে পাতাল-গহ্বরে
রাখ' গিয়া পুরি';
শাসি' এই পুরী
যাইব আমি তথায় সন্ধ্যার ভিতরে॥' ১৩৬॥

"অত্যাচার আমায় তুলিয়া রথে
ধাইয়া-চলিল যবে, দৈব-বশে দেখা-দিল পথে
বীর-রস বীর,
সদা উচ্চ-শির!
হেরি' তাঁ'র শরীর অরির মন ব্যথে॥ ১৩৭॥

"আমার ক্রন্দন শুনি', বীর-রস
বলে 'মোর সম্মুখে অবলা হরে—কাহার সাহস?'
বলি' অশ্ব-দলে
আটকিল বলে;
অত্যাচার বলিল কাঁপায়্যে দিক্ দশ—১৩৮॥

"'সাহসের জিজ্ঞাসিস্ পরিচয়,
অথচ শরীরে তোর একের অধিক মাথা নয়!
কাজে তুই খর্ব,
মুখে তাই গর্ব!
দু-পদ এগিয়া আসি' জিজ্ঞাসিতে হয়!' ১৩৯ ॥

"বীর-রস হইয়া দারুণ ক্রুদ্ধ
ধেয়ে-এ'ল অমনি; বাধিল তবে ভয়ানক যুদ্ধ।
রুধিরে-রুধির
হ'ল দুই বীর,
অত্যাচার পড়ি'-গেল হাতিয়ার-সুদ্ধ॥ ১৪০ ॥

"বীর বলে 'এবার দিলাম প্রাণ!
পুন' যদি দেখি তোর নষ্ট-রীতি, পাইবি না ত্রাণ!'
এতেক কহিয়া
আমায় লইয়া
দুর্গ-মধ্যে রাখিল করিয়া সাবধান॥ ১৪১ ॥

"বিশ্রাম লভিয়া বীর দিন-দুয়ে,
প্রমোদের আশ্রয়ে সঁপিল মোরে; সভা-মাঝে থুয়ে
নৃপ-সাথে যেই
গেল বীর, সেই
পাতালে আসিয়া মোর পা পড়িল ভূঁয়ে॥" ১৪২ ॥

দুঃখের কাহিনী শুনি' প্রমদার,
কত তা'রে সান্ত্বনা করিল দেবী, মুছি' কতবার
করিল নয়ন
বিমল গগন,
কতবার পুন' হ'ল মেঘের সঞ্চার॥ ১৪৩ ॥

বলে দেবী "কুসুম-কোমল তনু
তাপে ম্লান হয়েছে বাছার,—আর ভয় নাই অণু!
চিরন্তন সুখ
দেখাইবে মুখ!
ছুটি'-যা'বে বাদল ফুটিবে ইন্দ্রধনু! ১৪৪ ॥

"দিব্য-চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি আমি,
পিতারে দেখিবে তুমি সিংহাসনে, বীর হবে স্বামী
শত্রু-দল বধি'!
অশ্রু-ধারা-নদী
সুখার্ণবে মিলিবে! দু-দণ্ড থাক' থামি'!" ১৪৫ ॥

হেন কালে কল-কল-কল রোল
শ্রুতি-পথে আইল; প্রথমে যেন জলধি-কল্লোল—
ক্রমশ' ধুঁধুরি
শঙ্খ ভেরী তুরি
স্পর্ধিয়া গগন ছাড়িয়া-উঠে বোল ॥ ১৪৬ ॥

ষষ্ঠ সর্গ

সমর-প্রয়াণ

সূচনা

বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক-রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

নিরখি' সম্মুখ-বাগে
কবির চমক লাগে,
বীর-সৈন্য আসিতেছে কাতারে কাতারে।
ধবল কিরীট-পুচ্ছ
স্বর্গ-মর্ত্য করে তুচ্ছ,
উত্তাল-তরঙ্গ যেন ফেন উদগারে॥
সহস্র জিনিয়া সত্ত্ব
তুরঙ্গম রণ-মত্ত,
তাহে আরোহিয়া বীর হ'ল আগুয়ান!
হস্তে অসি ভয়ঙ্কর,
দারুণ প্রলয়ঙ্কর,
দেখিলেই থর-থর কাঁপয়ে পরাণ॥ ১॥

করুণা-দেবীরে দেখি'
বীর-রস বলে "একি!
সাক্ষাৎ ভবানী এ-যে জলদ-বিমানে।
পাদপদ্ম-তলে বসি
আধো-ঢাকা মুখ-শশী—
কমলা বিরাজে যেন কমল-বিছানে!"
বলিল ক্ষণেক-পরে
জীমূত-গভীর স্বরে,
"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" অমনি সব বীর
দাঁড়াইল সারি-সারি;
বীর-রস আগুসারি',
পুজিল চরণ-পদ্ম করুণা-দেবীর॥ ২॥

বলিল করুণাময়ী
"ধর্ম-যুদ্ধে হও জয়ী!
চিরজীবী হয়ে-থাক', ভুঞ্জহ মেদিনী!
কীর্তিতে পুরুক্ ধরা,
সার্থ হো'ক্ অসি-ধরা!"
হেন আশিসিলা দেবী সন্তাপ-নাশিনী॥
কবিরে ডাকিয়া পরে
বলিলেন বীর-বরে
"ভক্ত মোর এজন ইহারে লও সাথে।"
এত বলি' শুভঙ্করী
কবিরে কৃতার্থ করি',
বীর-কুল-কেশরীর সঁপিলেন হাতে॥ ৩॥

হেন কার্য সাধিয়া, নীরদ-রথে
আদেশিল কৃপা-ময়ী "চল' বাছা অদর্শন-পথে!"
নিদর্শন তাঁ'র
রহিল না আর!
অসংখ্য তাঁহার কাজ, অসংখ্য জগতে॥ ৪॥

ঠাহরিয়া-দেখিয়া উত্তম দেশ,
সৈন্য-গণে বীর-রস বিশ্রামিতে করিল আদেশ।
সৈন্য-সমাবেশ
হৈল যবে শেষ,
কবির, করিল তবে, শিবির-নির্দেশ॥ ৫॥

স্বপক্ষের সহায়-সামর্থ্য যত
সকল একত্র করি' বীর-রস, তা'র মধ্যগত
যতেক প্রধান
করি' আহবান,
মন্ত্রণায় বসিলেন হইয়া সংযত॥ ৬॥

দেব-দ্বয় মৈত্র আর অনুরাগ,
স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, কৌশল, এমনি আর যত মহাভাগ,
ঘেরি' বীর-রসে
মন্ত্রণায় বসে;
প্রহরী-সৈন্যেরা মাত্র আছয়ে সজাগ॥ ৭॥

সহসা প্রহরী-গণ দ্রুত-গামী,
জনেক জটীরে ধরি'-আনি' কহে "বলিছেন স্বামী,
'কাপুরুষ-দ্বেষী
বীর-শুভান্বেষী
দৈত্য-দানবের যম, উগ্রতপা আমি॥' " ৮॥

বীরে বলে কৌশল "কপট ইনি!"
কবি বলে "এ'র নাম ভণ্ড-তপ, এ'রে আমি চিনি!"
কহে ভণ্ড-তপ
"তবে তপ-জপ
মিথ্যা মোর? মঙ্গল করুন্ কপালিনী! ৯॥

"কে তুমি? আমায় বলিতেছ ভণ্ড?
জান' না, রুষিলে আমি, বীরের প্রতাপ দোরদণ্ড
সব হ'বে পণ্ড!
দেখা'ব, পাষণ্ড,
দেবতার কোপ-দৃষ্টি কেমন প্রচণ্ড?" ১০॥

বীর বলে "বারতা কি বল তাই!"
ভণ্ড বলে "কাছে শত্রু তথাপি তোমরা দেখ' নাই!
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
এই তিন দানব মিলেছে এক ঠাঁই! ১১॥

"পিছনে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী!
তাহে ভয়ানক-রস রণার্ণবে ভীষণ কাণ্ডারী!"
এড়াইতে দণ্ড
সত্য কহে ভণ্ড;
গুপ্ত-চর কিন্তু সে মোহন্ত জটাধারী! ১২॥

বীর বলে "আদেশ প্রচার কর'—
সাজিয়া দাঁড়া'ক্ সৈন্য, মন্ত্রণায় মিথ্যা কাল হর'!
দানবের সেনা
বিলম্ব সহে না,
আমরা কি সহিব? ধর' কৃপাণ—ধর'!" ১৩॥

বলিলেন কৌশল "কাজের আগে
মন্ত্রণার বচন শুনিবে, না-ও যদি ভাল-লাগে।
মন্ত্রণা যা' বলে
কালে তাহা ফলে!
ধৈর্য হারাইতে নাই বীর্য-অনুরাগে॥ ১৪ ॥

"ধৈরজ ধরিয়া শুন' পরামর্শ;
মাথার উপর-দিয়া গেছে মোর পঞ্চাশত বর্ষ—
তাহার বিংশতি
এই ব্রতে ব্রতী!
মোর বাণী না শুন'—রিপুর হ'বে হর্ষ!" ১৫ ॥

বীর বলে "শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ-বচন,
তথাপি সম্মুখ-রণে বিলম্বিতে নারি কদাচন।
জয়-বা-মরণ
কর্‌য়ো না বারণ।
আর যাহা বল' তাহা শির-আভরণ॥" ১৬ ॥

কৌশল বলিল "তব অসি-চর্ম
কাড়িয়া লইতেছি না! শুন' আগে বচনের মর্ম,—
শুনি', তা'র পর
করিও উত্তর!
যাহা আমি বলিব তোমারি তাহা কর্ম॥ ১৭ ॥

"যুটিয়াছে যত দৈত্য, যত দানা,
যত যা'র বল-বীর্য-পরাক্রম, আছে মোর জানা।
অগ্রসর হয়্যে
যে'তে চাই লয়্যে,
ষোলো-আনা বলের কেবল দুই আনা॥ ১৮ ॥

"অসুর-দুজনে আর দৈত্য-তিনে
ছলে আকর্ষণ-করি' আনি'-দিব তোমার অধীনে।
তুমি তা'র পর
আছ বীর-বর,—
রক্তে ডুবাইবে সবে, শস্ত্র-দুরদিনে॥ ১৯ ॥

"দাক্ষ্য স্বাস্থ্য যুঝিবে দুর্ভিক্ষ মারী;
দ্বেষ-হিংসা-দোঁহে মৈত্র অনুরাগ দেব-অস্ত্র-ধারী।
অত্যাচারে আমি
রসাতল-গামী
করিব, ভয়াল-রস বধ্য সে তোমারি॥ ২০॥

"সন্ন্যাসীটি নহেন সামান্য লোক!
বোধ হয় গুপ্তচর! উগরিছে কটা দুই চোক
দুষ্ট অভিসন্ধি!
কর' ও'রে বন্দি!
ভেদ করিয়াছি আমি উহার নির্মোক॥ ২১॥

"কে আছিস্, উহারে বাঁধিয়া রাখ্;
বিচার হইবে পরে, হত্যাকাণ্ড আগে হয়ে্যে যাক্—
হই আগে স্থির!
যুদ্ধ ঘোষ' বীর—
রণ-ভেরী বাজুক, বাজুক জয়-ঢাক!" ২২॥

পাতাল-অবধি-গগন স্পরশি'
বাজিল যখন তুরী-ভেরী-শঙ্খ, বাহিনী-জলধি
একটি ইঙ্গিতে—
ঘোর তরঙ্গিতে
লাগিল, এ-মুড়া হ'তে ও-মুড়া অবধি॥ ২৩॥

ঝঞ্ঝনিয়া উঠিল অযুত বর্ম,
মুহূর্তে সাজিয়া-দাঁড়াইল সৈন্য ধরি' অসি-চর্ম।
সাদী সবে, অশ্ব
বাছি' লয়্যে স্ব স্ব,
আরোহিয়া-বসিল সাধিতে বীর-ধর্ম॥ ২৪॥

কৌশল, মন্ত্রণা করি' সমাধান,
কামান, পদাতি, সাদী, সবাকার নিরূপিয়া স্থান,
লইয়া কেবল
দুই আনা বল,
করিল রিপুর আগে পলায়ন-ভান॥ ২৫॥

দানবেরা ভাবিল—অসংখ্য দল
পলাইছে তরাসে, এমনি খেলা খেলিল কৌশল।
দ্বেষ-হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার
পিছনে করিল তাড়া লয়্যে দল-বল॥ ২৬॥

রিপু-মাঝে ফেলিয়া কৌশল-চার,
চাহি'-আছে বীর-রস কতক্ষণে আসে অত্যাচার;
সকলি প্রস্তুত,—
হেন-কালে দূত
"অদূরে দানব-সেনা" দিল সমাচার॥ ২৭॥

"সৈন্য-গণ দাঁড়াও!" বলিল বীর
"সাজাইয়া কামান, কৃপাণ খুলি', হয়্যে-থাক' স্থির।
আসিছে অরাতি
যেন মত্ত হাতী,
সিংহের বদন-দ্বারে নিবেশিতে শির॥ ২৮॥

"অই শুন', দানবের অহঙ্কার
শাসাইছে স্বর্গ-মর্ত্ত্য! অই শুন' ছাড়িছে হুঙ্কার!
কা'র সঙ্গে যুঝে
তাহা নাহি বুঝে!
তোমা-সবে চিনে না, চিনিবে এইবার! ২৯॥

"এক দেহে ধরিয়া অযুত প্রাণ,
একপ্রাণ ধরিয়া অযুত দেহে, রাখ' এই স্থান!
কামান-বন্দুক
যতই গর্জ্জুক,
অটল হইয়া থাক' অচল-সমান॥" ৩০॥

রিপু-বল-দলন চরণ-দাপে
কাতারে কাতারে এ'ল দৈত্য-গণ, ভীষণ-প্রতাপে।
দ্বেষ হিংসা আর
ঘোর অত্যাচার,
তিনে দেখি' এক ঠাঁই চৌদ্দ-লোক কাঁপে॥ ৩১॥

রণ-শিঙ্গা, দ্বেষানলে দিয়া ফুঁক,
রোষে কাঁপি' ঘোষে যেন, শমনের লাগিয়াছে ভুখ!
অযুত-অধিক
দেখিয়া অনীক,
দিগ্বধূ-সবার বুক করে ধুক্‌ধুক্‌॥ ৩২॥

বীর-সৈন্যে করিয়া ভীষণ লক্ষ্য,
ঝটিতি দানব-সেনা বিস্তারিল মহা দুই পক্ষ।
কামানের রথ
(সম্মুখের পথ
পরিষ্কার করিবারে শমন প্রত্যক্ষ) ৩৩॥

ঘর্ঘরিয়া দাঁড়াইল আগে গিয়া।
হ্রেষি'-উঠি' তুরঙ্গ, সমর-রাগে বিষম রাগিয়া
বঙ্কিম-গ্রীবায়
খলিন চিবায়;
বীরের হৃদয়ে উঠে আগুন জাগিয়া॥ ৩৪॥

বলে বীর যোধ-সবে,
"মাত' রণ-মহোৎসবে,
দ্রুত-গতি আসিতেছে শমনের খাদ্য।
তোমাদের জয়ে আজ
তুষ্ট হ'বে দেব-রাজ
স্বর্গ-ময় হ'বে আজি নৃত্য-গীত-বাদ্য॥
সেই স্বর্গ চাহ' যেই
আজি এই মুহূর্তেই
পাইবে! না পাও যদি তোমাদেরে ধিক্‌!
ধরিও না তলবার,
প্রত্যেকে তোমা-সবার
না যদি বধিতে-পার' শতের অধিক॥ ৩৫॥

"অত্যাচার-হত্যাঘরে
পৃথিবী রোদন-করে,
ঘাতকের হস্তে যথা গাভী দীন-হীন।

রাখাল তোমরা সবে,
বৎস-গণ আর্ত্ত-রবে
তোমাদের পানে তেঁই চাহে নিশিদিন॥
তোমরা থাকিতে বীর,
এই দশা পৃথিবীর?
বীরের সম্মুখে দৈত্য তুলিবে মস্তক?
হান' বাজ! হান' বাজ!
জানুক্ দানব-রাজ
বীর-হস্তে কৃপাণ কেমন ভয়ানক! ৩৬॥

"মর্ত্ত্য-দেহে কর' সবে তুচ্ছ বোধ!
লভ' স্বর্গ, লভ' জয়! এগোও এগোও সব যোধ!
দীন-অশ্রু-জলে
সমুদ্র উথলে,
রুধির-সমুদ্রে আজি দেও তা'র শোধ॥" ৩৭॥

যেই-মাত্র শুনিল বীরের বাণী,
সিংহ-নাদ ছাড়ি'-উঠে, দশ-লক্ষ অভীত পরাণী!
অযুত তুরঙ্গ
তেজ-স্ফীত-অঙ্গ
হ্রেষিতে লাগিল ঘোর, শান্তি নাহি মানি'॥ ৩৮॥

তা'র সঙ্গে বৃংহিতে-লাগিল করী;
শত-শত জয়-শিঙ্গা বাজি'-উঠে ঘোর শব্দ করি'।
তুরী-ভেরী-শঙ্খ
বাজিল অসংখ্য,
কাঁপাইয়া দিক্-দশ গগন বিদরি'॥ ৩৯॥

চারিদিকে জমিতে-লাগিল মেঘ,
কায়া যা'র নিবিড় সৈনিক-পঙ্‌ক্তি, মহা যা'র বেগ।
সম্বরিয়া কোপ
মৌন রহে তোপ;
স্তব্ধতায় জনমায় প্রাণের উদ্বেগ॥ ৪০॥

অস্ত্র ধরি' সবে, আছয়ে নীরবে;
অধীর হয়েছে কিন্তু, মাতিবারে সমর-উৎসবে!
বেগে ধ্বজ-পট
করে লটপট,
ঊর্মি বিলসিত করি' সেনা-মহার্ণবে॥ ৪১॥

কামানের তখন খুলিল মুখ,
নাচাইয়া বীরের, কাপুরুষের দমাইয়া বুক।
জুড়ি' রণ-ভূম
উড়ি'-উঠে ধূম,
বিদ্যুতিয়া-উঠে, আর, অযুত রঞ্জুক॥ ৪২॥

কামানের উত্তর প্রতি-উত্তর
আরম্ভিল; ফোয়ারা খুলিয়া-গেল অমনি সত্বর
শত-শত সের
আয়স-পিণ্ডের;
প্রলয়ে মাতিল যেন আগ্নেয় ভূধর॥ ৪৩॥

হইতেছে এমনি গোলার বৃষ্টি,—
তোপের ধমকে তাপি' গগন, করিছে যেন সৃষ্টি
অসংখ্য উলকা—
ছাড়িয়া হলকা
জ্বলিয়া-চলিছে গোলা ধাঁদাইয়া দৃষ্টি॥ ৪৪॥

দূর-হৈতে নাশিয়া অরাতি-দল
বীরত্ব বিরক্ত হ'ল; হাতে-হাতে পাইবারে ফল,
চোঙে ভরি' গুলি
জয়-ধ্বজা তুলি'
পৃথবী কাঁপাইয়া-চলে বীররস-বল॥ ৪৫॥

মৃত-দেহ পদ-তলে মরদিয়া,
এগিয়া-দাঁড়ায় শত-শত বীর যমে স্পরধিয়া।
স্মরি' বীর-ব্রত
ধায় শত-শত,
লক্ষ কামানের মুখে বক্ষ পাতি' দিয়া॥ ৪৬॥

সাক্ষাৎ সংহার-মূর্তি যেন শূলী,
আক্রমিল বীর-রস; অমনি অজস্র গোলা-গুলি
পড়ি' অনর্গল
ভাঙে দৈত্য-বল,
হল্লা করি' চলে বীর তলবার খুলি' ॥ ৪৭ ॥

অস্ত্রে অস্ত্রে না হইতে ঘরষণ,
যাহা বরষিবার, বন্দুক, তাহা করি' বরষণ,
বেগে অকস্মাৎ
করিয়া ঝনাৎ
ধরিল আরেক মূর্তি লোম-হরষণ—॥ ৪৮ ॥

দাঁত মেলি'-উঠিল সঙ্গীন-ছুরী!
নিবিড়-জলদ যেন দিশি-দিশি উঠিল চিকুরি'!
সম্মুখা-সম্মুখি
দুই দল ঝুঁকি'
রণ-ভূমি করি'-তুলে শমনের পুরী ॥ ৪৯ ॥

অস্ত্র-শস্ত্র ওঁচাইয়া মহাবলে,
হল্লা-রব করিয়া উভয়-দল মিলিল যে-স্থলে;
দল-পারাবার
হয়ে একাকার
ঘুরণা-সমান ঘুরে আক্রমণ-বলে ॥ ৫০ ॥

দুই দিক্ হইতে দুর্বার নদী
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আসি'-পড়ে যদি,
কলকল-ঘোষে
ফেনাইয়া-রোষে
উচ্চে ঠিকরিয়া-উঠে গগন স্পরধি' ॥ ৫১ ॥

তেমনি মাতিয়া-উঠি' রণ-মদে,
একত্র মিলিল আসি' দুই দল, তুমুল শবদে।
হুঙ্কার-নিনাদ
হয়ে উনমাদ,
আর্তনাদে ডুবাইল রুধিরের হ্রদে ॥ ৫২ ॥

তোড়-পাড় হইতে-লাগিল দল,
অস্ত্র ঝঙ্কারিয়া-উঠি' জানায় কাহার কত বল।
জয়-জয়-রবে
এগোয় গরবে,
পিছোয় অমনি পুন', না পাইয়া স্থল॥ ৫৩॥

বীর-সেনা সাক্ষাৎ শমন-দূত,
চসিয়া-চলিল দানবের ব্যূহ শস্ত্র-হল-যুত।
মাথা কাটা পড়ে,
তবু নাহি নড়ে,
কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদভুত! ৫৪॥

কাটা মুণ্ড খট্-মট্ চাহি'-রয়,
নয়নে ফাটিয়া-পড়ে রুধির, অনল বাহিরয়!
বাহু-পদ-হস্ত
গিয়াছে সমস্ত,
অস্ত-দিবাকর তবু তেজ উগরয়! ৫৫॥

বীর-পক্ষে তুরঙ্গ-সহায় আসে,
মুখময় ফেন বহে, ঝড় বহে নাসার নিশ্বাসে।
অসি ধরি' হাতে,
জিনি বেগ-বাতে,
উড়ি'-চলে অশ্বারোহী সমর-উল্লাসে॥ ৫৬॥

রজো-ধূমে বলের বিস্তার ছাপি',
একেবারে অগণন তুরঙ্গ পড়িল-আসি' চাপি'।
কত অশ্ব পড়ি'
যায় গড়াগড়ি,
হ্রেষিয়া আছাড়ে পদ করি' দাপাদাপি॥ ৫৭॥

সাক্ষাৎ শমন সে-যে, হয়-রূপী;
ক্ষণ-মাঝে আরম্ভিল আসিয়া দারুণ কোপাকুপি;
কৃপাণের বল
শূন্য করে দল,
কেহ-বা গুঁচায় খোঁচা, কেহ ধরে লুফি'॥ ৫৮॥

খোঁচা খেয়ে তুরঙ্গ খিঁচায় মুখ,
পিছায় দু-এক পদ, পুন' হয় রণে-উনমুখ।
শত মুখে হায়
শত অস্ত্র খায়,
আঁচায় শোণিতে তবু নাহি মিটে ভুখ॥ ৫৯॥

অশ্ব আসি' করিল দারুণ-কাণ্ড!
চুরমার করিয়া ফেলিল দল, যেন মৃদ্‌ভাণ্ড!
পড়ি'-যায় মুণ্ড
রুধিরের কুণ্ড,
দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ে শরীর প্রকাণ্ড॥ ৬০॥

সাদি-দল-কেশরী কৃপাণ-নখে
এমনি করিল কাজ, অরি-করী আঁধার নিরখে!
শোণিত-বৃষ্টিতে
না পারি' তিষ্ঠিতে,
ছটকিয়া-পড়ে সবে, কে কা'রে আটকে॥ ৬১॥

বীর-পক্ষ প্রবল হইল ক্রমে,
হত-বল হইল দানব-দল বীর-পরাক্রমে।
বন্দুকের নল
হ'ল বীতানল,
শান্ত হ'ল দিগ্বিদিক্ ধ্বনি-উপশমে॥ ৬২॥

হেন-কালে দেখা-দিল মহামারী!
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী—না বাছে বৃদ্ধ, কুমার, কুমারী!
যাহার নিশ্বাস
জ্বলন্ত হুতাশ!
যম-সম দৃষ্টি যা'র সৃষ্টি-লোপ-কারী।৬৩॥

মহামারী নিরখিয়া স্বাস্থ্য-বীরে,
গদা-হস্তে ধাইয়া-আইল রোষে গর্জিয়া গভীরে।
মারি' এক বাড়ি
স্বাস্থ্যে ফেলে পাড়ি',
ভূমি-গেল স্বাস্থ্য-বীর ব্যথা পেয়ে শিরে॥ ৬৪॥

শুনা-গেল ঘোর ডমরুর শব্দ,
কাঁপিতে কাঁপিতে সবে যুড়ে পাণি, হইয়া নিস্তব্ধ।
আসিছেন রুদ্র,
তপের সমুদ্র,
দারুণ-দর্শন যথা প্রলয়ের অব্দ॥ ৬৫॥

হস্তে মহা-ত্রিশূল, রক্ত-লোচন;
কালানল-মূরতি স্ফুরতি পায়, প্রাণ-বিমোচন।
মাথাময় জটা,
শোণ-সম কটা;
বক্র কটাক্ষিলে আর নাহিক বাঁচন॥ ৬৬॥

সাধ্য কা'র মুখ-প্রতি দেখে চেয়ে,
দূর-হৈতে নিরখিয়া পড়ে সবে পৃথ্বী-তল ছেয়ে,
শাসিতে রাক্ষসী
চরাচর-বশী
দাঁড়াইল রুদ্র-রস; মারী এ'ল ধেয়ে॥ ৬৭॥

রুদ্র কহে "স্থির হও যোধ-পঙ্‌ক্তি!"
রাক্ষসীরে বলিলেন "দেখিব তোমার আজি শক্তি!"
বলিল রাক্ষসী,
"কে হেন সাহসী—
যমেরে ঘাঁটায় আসি' কে এমন ব্যক্তি!" ৬৮॥

এত বলি' রাক্ষসী অনল শ্বসে;
সেনা-সবে অমনি তাপিত শিরে হাত দিয়া বসে।
বিষাইল বায়ু,
শেষাইল আয়ু,
কৃশাইল বলবান্, তাহার তাড়সে॥ ৬৯॥

রুদ্র-রস হুঙ্কারিল রোষ-ময়!
দিক্ অন্ধকার করি' জলধর গর্জে অসময়!
বড় বড় শিল
হইয়া শিথিল,
পড়িল বারেক-দুই জনমিয়া ভয়॥ ৭০॥

ভাগি'-যায় তড়িৎ আকুল-বেশে;
হড়্ মড়্ কড়্ মড়্ শব্দ হয় বিমান-প্রদেশে।
তড়িৎ-লহরী
বেড়ায় বিহরি'
নিখিল গগন-ময় একৈ নিমেষে॥ ৭১॥

স্বর্গে মর্ত্যে এমনি বাধিল দ্বন্দ্ব,
তড়িৎ-চমক দেখি' আঁখি-সব হয়্যে-প'ল অন্ধ।
গরজন-ধ্বনি
বাড়িল এমনি,
শ্রবণ-কুহর সব, হয়্যে-গেল বন্ধ॥ ৭২॥

মুহূর্তেক দাঁড়াইয়া ধৈর্য ধরি',
বজ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-প'ল মারী-ভয়ঙ্করী।
সর্বাঙ্গ তাহার
হ'ল ছার-খার,
প'ল যেই ম'ল সেই মহা-নিশাচরী॥ ৭৩॥

গগনে মগন হৈল রুদ্র-রস,
বিদ্যুৎ নিভিয়া-গেল, প্রশান্ত হইল দিক্-দশ।
ছিন্ন মেঘ-মাঝে
তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস॥ ৭৪॥

দুরভিক্ষ কা'রো কাছে নহে ন্যূন!
মৃত্যু-কালে বৃত্রাসুর দিল তা'রে, রৌদ্দর-বরুণ,
দুই অস্ত্র বলি';
সেই বলে বলী,
দাক্ষ্যে বিনাশিতে-যায় দৈত্য নিদারুণ॥ ৭৫॥

সন্ধান করিল যেই বাণ-দ্বয়,
আগুণ হইয়া-উঠে গগন, বসন নাহি সয়।
শুখাইয়া তরু
পৃথ্বী হ'ল মরু,
দ্বাদশ তপন যেন একত্র উদয়॥ ৭৬॥

ক্ষণ-পরে আবার তেমনি বৃষ্টি!
মেঘে মুখ-ঢাকিয়া দেবতা-গণ ডুবাইল সৃষ্টি!
বৃষ্টি-রব ছাড়া
নাহি শব্দ-সাড়া,
বৃষ্টি-বিনা কিছু আর নাহি হয় দৃষ্টি॥ ৭৭॥

জল পেয়ে প্রাণ-পেয়ে-উঠে তরু;
শষ্পি'-উঠে তৃণ-ভূমি, বাষ্পি'-উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা
হাসি'-উঠে চাসা,
মাঠ-ময় বাজি'-উঠে ভেকের ডমরু॥ ৭৮॥

কাঁদিয়া বাড়ায় বৃষ্টি কৃষি-গণ!
লম্ফে-ঝম্ফে ধরায় ভাঙিয়া-পড়ে দুর্বার গগন।
ব্যাঙে ডাকি' ব্যাঙে
মিছে গলা ভাঙে,
বৃষ্টিরবে সে রব পাতালে নিমগন॥ ৭৯॥

দাক্ষ্য কিবা অদভুত পরাক্রমে
যুঝিল অসুর-সনে, হটিল না বীর কোন-ক্রমে।
দুরভিক্ষ তা'রে
যত বাণ মারে,
সমস্ত কাটিয়া ফেলে একৈ উদ্যমে॥ ৮০॥

দেশ-ময় দাপিয়া-বেড়ায় দাক্ষ্য;
মুহূর্তেক স্থির নাই হস্ত-পদ, মুখে নাই বাক্য।
মারিতেছে বাণ
অমোঘ-সন্ধান,
শত-শত বাহু জিনি ভীষণ-কটাক্ষ॥ ৮১॥

এক হস্ত শত কিংবা ততোধিক!
একৈ নিমেষে বীর তীরে-তীরে ঘিরে চারি দিক্।
দক্ষিণ, উদীচী,
পূরব, প্রতীচী,
কা'রে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক॥ ৮২॥

চারি-দিকে শোঁ শোঁ করে শিলীমুখ,
কোন্ দিক্ ঠেকাইবে! ভাবনায় কালি হ'ল মুখ।
হ'ল মতি-ভ্রম,
গেল পরাক্রম,
দাক্ষ্যের উদ্যম দেখি' দমি'-গেল বুক॥ ৮৩॥

স্তম্ভিত হইল যদি দেব-অরি;
বলদেব যুঝিতেন যেই অস্ত্রে, সেই অস্ত্র ধরি'
দাক্ষ্য মহা-শূর
বাঁধিল অসুর,
অস্থি-সার দেহ তা'র বিদারি' বিদারি'॥ ৮৪॥

সম্মুখে দেখিয়া, দ্বেষ, অনুরাগে,
ধৈরজ ধরিতে নারি', দুরমতি, দ্বন্দ্ব-রণ মাগে।
হয়ে মহা-ক্রুদ্ধ,
বলে "দেহি যুদ্ধ,"
"এহি" বলে অনুরাগ তেমনি সোহাগে॥ ৮৫॥

রোষানলে জ্বলিল দ্বেষের অঙ্গ,
বলে দৈত্য "আসি এই, দেখাই তোমায় এই রঙ্গ!"
এতেক বলিয়া
অসি নিকলিয়া,
হানিতে-লাগিল যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ॥ ৮৬॥

চর্মে-বর্মে পড়িতে-লাগিল চোট
তড় তড় শিলা-বৃষ্টি জিনি হয় শবদের স্ফোট।
দৈত্য মহা-দর্প
শ্বসে যেন সর্প,
বিকট করিয়া মুখ, দংশিয়া ঠোঁট॥ ৮৭॥

অনুরাগ, তরুণ-অরুণ-চ্ছবি,
রহিল অটল-পদে, স্মরি' নিজ অমর-পদবী।
চাহে ক্ষণ-পরে
দ্বেষের উপরে,
কুজ্‌ঝটিকা-ঘন-প্রতি চাহে যথা রবি॥ ৮৮॥

মন্ত্রাহত যেমতি কুপিতা ফণী,
অনুরাগ-নয়নে পড়িয়া দ্বেষ হইল তেমনি।
হ'ল মহাবলী
আড়ষ্ট পুথলী,
অসি-অস্ত্র খসি' পড়ে আপনা-আপনি॥ ৮৯ ॥

আপনার অনলে আপনি দ্বেষ
জ্বলিতে-লাগিল তবে; যন্ত্রণার নাহি আর শেষ—
না যায় কহন,
না যায় সহন,
কেবল দহন-সার, নরক-বিশেষ! ৯০ ॥

গুমরিয়া গুমরিয়া রোষানলে
তাপি'-উঠে কলেবর, ক্ষণ-পরে ধু ধু করি জ্বলে।
এমনি করিয়া
গেল সে মরিয়া,
শেষ হ'ল দ্বেষ-রিপু অনুরাগ-বলে॥ ৯১ ॥

যুঝে মৈত্র হেতায় উদার-প্রাণে;
বিষাক্ত করিয়া ছোরা চায় হিংসা তা'র মুখ-পানে।
অনভিজ্ঞ জন
জানে না কেমন্
সে তাহার চাহনি, যে জানে সেই জানে॥ ৯২ ॥

ভুজঙ্গ যেমন থাকে তৃণে-ঢাকা—
বজ্র থাকে মৌন ধরি গুটাইয়া তড়িৎ-পতাকা।
হিংসার চাহনি
সেই-রূপ গণি,
সুযোগ-বিহনে শুধু ধৈর্য ধরি' থাকা! ৯৩ ॥

মৈত্র-পানে হিংসা করি' নেত্রপাত
গুপ্ত-ছোরা সহসা বাহির করে, বুক যেন দাঁত।
হয়্যে অগ্রসর
দুরাত্মা পামর
বলে "শুভক্ষণে আজ লভিনু সাক্ষাৎ॥" ৯৪ ॥

এত বলি' শকত করিয়া মুঠি,
হস্তে ধরি' বজ্র-বল, নেত্রে ধরি' দারুণ ভ্রূকুটি,
রুখিয়া-পড়িয়া,
বিঁধিয়া ছড়িয়া,
হানিতে লাগিল ছুরী না করিয়া ত্রুটি ॥৯৫॥

পাশ-অস্ত্র হস্তে করি' মৈত্র-বীর,
দৃঢ়-বক্ষে ঋজু-কায়ে গিরি-সম রহিলেন স্থির।
সেই তা'র বক্ষ
করি' ঘোর লক্ষ,
করিল হিংসা-রিপু রুধিরে-রুধির ॥ ৯৬ ॥

মৈত্র সে অমর-জাতি; দৈব-বলে
হলাহলে অমৃত করিয়া-লয় দিব্য কুতূহলে।
ক্ষত সব তায়,
যোড়া লাগি' যায়,
হিংসা পলাইয়া-যায় সৈন্য-কোলাহলে ॥ ৯৭ ॥

মৈত্র-দেব ছাড়িল বন্ধন-পাশ;
অমনি হিংসার গলে তিন-ফের পড়ি' গেল ফাঁস।
মুখ বিকটিয়া,
আঁখি উলটিয়া,
জিহ্বা বাহির-করি' চলি'-গেল শ্বাস ॥ ৯৮ ॥

হইল, কৌশলে আর অত্যাচারে,
মুখামুখি! বলে দৈত্য "আজি তোরে পাইয়াছি কারে!
দি'ব প্রতিফল,
পি'ব তবে জল!
তুই মাথা নোয়াইলি আনন্দের দ্বারে? ৯৯ ॥

"আনন্দের প্রসাদ এত কি মিষ্ট?
মানুষ হইলি তুই মোর খেয়ে, অধম পাপিষ্ঠ,
তাহা ভুলি' যা'স্!
চরণের দাস
ছিলি—তা' গেছিস্ ভুলি'—খেতিস্ উচ্ছিষ্ট!" ১০০॥

কৌশল বলিল তবে "তোর চেয়ে
আছে কি রে পাপিষ্ঠ! ভিতরে তোর দ্যাখ্ দেখি চেয়ো—
জন্তু কি নহিস্?
তবুও কহিস্
মানুষ হয়েছি আমি তোর অন্ন খেয়ো! ১০১ ॥

"হিংস্র জন্তু যে-জন তাহার খেয়ো
মানুষ! কি মতিভ্রম! হয়েছিনু বন্য-পশু চেয়ো
অধম পরাণী!
মানুষ ইদানী
হইয়াছি আনন্দের পদ-চ্ছায়া পেয়ো॥ ১০২ ॥

"দিবা-রাত্রি কর্ণে শুনি' হাহাকার,
অন্ন বিষাইত মুখে, শয্যা হ'ত তপত অঙ্গার!
অন্য গতি-হীন
আছিনু যদিন,
সয়েছিনু ত'দিন! সে দিন নাই আর!" ১০৩ ॥

অত্যাচার বলিল "তোমার দিন
ফুরাইয়া-আসিয়াছে! আর কেন বাড়াইছ ঋণ!"
বলি' অত্যাচার,
খুলি' তরবার,
"তবে রে পাষণ্ড" বলি' কোপ দিল তিন॥ ১০৪ ॥

অত্যাচার যেমন চতুর্থ-বার
ওঁচাইল কৃপাণ, কৌশল-বীর ভাব দেখি' তা'র
ঝটিতি সরিয়া,
ঝনাৎ করিয়া
দু-টুকুরা করি'-ফেলে দৈত্য-তলবার॥ ১০৫ ॥

পাছু হটি' অত্যাচার দ্রুতগতি,
কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া মহা এক ভীষণ শকতি,
শোঁ শব্দ করিয়া
বায়ু বিদারিয়া
ছাড়িল সটান বেগে কৌশলের প্রতি॥ ১০৬ ॥

উরগ-শ্বসিত জিনি শব্দ করি'
শকতি সে আসিছে প্রবল-বেগে অনল উগরি';
ইহা দেখি বীর
করি মনঃস্থির
লুফিয়া ধরিল তা'রে দর্প তা'র হরি'॥ ১০৭॥

ক্রুদ্ধ ফণী মন্ত্রে যেন রুদ্ধ-গতি,
কৌশল-মুষ্টিতে পড়ি' শকতির ঘুচিল শকতি।
শক্তি সে রিপুর
হাতাইয়া, শূর
তাহাই ছাড়িল পুন' রিপু-দেহ প্রতি॥ ১০৮॥

"প্রভু ইনি হ'ন"—নাহিক স্মরণ!
বক্ষ বিদারিল শক্তি না মানিয়া বর্ম্মের বারণ।
করি' ঘোর রব
পড়িল দানব;
আপন শক্তিব ফেরে লভিল মরণ॥ ১০৯॥

বীর বলে "কোথা তুই ভয়ানক!
কোথা তুই পামর! কবিরে তুই করিস্ আটক?
কোথা তুই! অরে!
তোর মুণ্ড-তরে
কৃপণের জিউভা করিছে লক্ লক্॥" ১১০॥

ভয়ানক, শুনিয়া আহ্বান-ধ্বনি
আরক্ত-নয়নে দাঁড়াইল, যেন উদ্যত অশনি।
বলে বীরোত্তমে
"কালান্তক যমে
ডাকিতেছ কে তুমি? আমায় কি চেন'নি? ১১১॥

"দৈত্য আমি কেমন, দেখা'ব তবে!"
বলি' রাঙাইল আঁখি, গরজিয়া হুহুঙ্কার-রবে।
মারে যদি লাথি
শুয়ে পড়ে হাতী,
দাঁড়াইল রোষে মাতি' এমনি গরবে॥ ১১২॥

বীর বলে "ত্বরায় চলিয়া আয়!
অধীর হয়েছে মোর কৃপাণ রুধির-পিপাসায়!
র'বে তোর মাথা
ব'ড়সায় গাঁথা,
দেখিবে আবাল-বৃদ্ধ! দেখি কে বাঁচায়!" ১১৩॥

এত বলি' আক্রমিয়া ভয়ানকে,
শত শত কোপ মারে এক এক আঁখির পলকে।
শ্বসিতে শ্বসিতে
অসিতে অসিতে
বাধায় তুমুল দ্বন্দ্ব, অনল ঝলকে॥ ১১৪॥

বীর-রস দেখিয়া-দেখিয়া বাগ,
মারিছে এমনি কোপ—হস্তীকে যেমন বন্য বাঘ
প্রচণ্ড থাবায়
দুদণ্ড ভাবায়
শুণ্ড মুণ্ড গণ্ড আদি করি' ভাগ ভাগ॥ ১১৫॥

ভেবরিয়া গে'ল যেই ভয়ানক,
আর তা'রে ফেলিতে দিল না বীর একটি পলক!
মারি' এক কোপ
বাহু করে লোপ,
তেমনি আরেক কোপে খসায় মস্তক॥ ১১৬॥

"সাধু-সাধু" রব উঠে নভোময়;
পুষ্প-রাশি পড়িল; মেদিনী জুড়ি' উঠে জয়-জয়।
বাজিল দুন্দুভি,
সিন্ধু যেন ক্ষুভি'
বেলা-সনে খেলা-করি' ধীরে গরজায়॥ ১১৭॥

সপ্তম সর্গ

শান্তি-প্রয়াণ

সূচনা

রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য-উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তি সকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভ পরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

কামানের বন্দুকের ধূম-চয়
ক্রমে সরি'-পড়িল; অমনি সেই রণ-ভূমি-ময়
ক্ষত আর মৃত
হইল বিস্তৃত,
দেখিয়া কবির হ'ল করুণা-উদয়॥ ১॥

অস্ত্র-হাতে শত শত মহা-বীর
নিদ্রা-যায় রণ-ভূমে, সর্ব দেহ রুধিরে-রুধির।
বক্ষ বিদারিত,
অস্ত্র অনাবৃত,
জড়-পিন্ড হয়ে-রহে ধড়-বাহু-শির॥ ২॥

কত পড়ি' রকতা-রকতি হয়;
ঘেঁচড়িয়া টানিয়া টানিয়া দেহ, পি'তে চায় পয়।
যন্ত্রণার পাকে
শমনেরে ডাকে
"শীঘ্র লও, শীঘ্র লও, আর নাহি সয়!" ৩॥

দেখি' শুনি' এ হেন দারুণ-দৃশ্য,
ভাবে কবি "এই ঘোর দুঃস্বপন—এ'র নাম বিশ্ব!
আইস' আইস'
বৈরাগ্য! আশিস'
ছাড়ি' ভব-দাসত্ব তোমার হই শিষ্য!" ৪॥

এত বলি' শান্ত-সমাহিত চিতে
চাহি' করুণার পানে সকাতরে লাগিল ডাকিতে,
"স্বর্গ হ'তে উলি'
লও মোরে তুলি'
পারি না পারি না আর এ-সব দেখিতে॥ ৫ ॥

"অন্ধকারে হইয়া অনন্য-গতি
নয়ন-চকোর যাচে পদ-নখ-চাঁদের পংকতি।
এ কি ভয়ানক!
আপাদ-মস্তক
ঘুরিছে, দাঁড়াই স্থির—নাহি সে শকতি!" ৬ ॥

ভকতের ক্রন্দনে বন্ধনে পড়ি',
স্বর্গ হ'তে নামি'-আইলেন দেবী মেঘ-যানে চড়ি'।
সঙ্গে একজন
দিব্য-দরশন
আইল মহাপুরুষ, হস্তে হেম-ছড়ি॥ ৭ ॥

রহি' মেঘ-রথে, প্রণত ভকতে
বলে দেবী "সুসঙ্গ ইনি তোমায় তপো-পরবতে
পথ দেখাইয়া
যা'বেন লইয়া;"
এত বলি' চলি'-যান দেবযান-পথে॥ ৮ ॥

সুসঙ্গ, কনক-দণ্ড যা'র হাতে,
কবিবরে সম্ভাষিয়া বলিল "আইস মোর সাথে।"
পুরা যবে রাত্রি
দুইজন যাত্রী
তপোগিরি নিরখিল উন্নয়ন-পাতে॥ ৯ ॥

সুসঙ্গ কহিল "এই তপোচল!
দুরধর্ষ, কোথাও গৃহ-বাসীর নাহি চলাচল!
দেখ্যেছ—অরণ্য
কি ঘোর বিষণ্ণ!
অশিব ডাকিছে শিবা, শুন' কোলাহল॥ ১০ ॥

"মধ্যাহ্ন দিবসে, আঁধার নিবসে!
তিলার্ধ নড়ে না রাতি, অরণ্যের প্রশ্রয়-সাহসে।
সঙ্কট বড়ই!
গর্জে শুন অই—
গুহার ভাঙিছে ঘুম উহার তাড়সে॥ ১১॥

"কতদূর তোমার এখানে থাকা
সঙ্গত, এখনো বুঝ'! পথ-ঘাট বনে সব ঢাকা!"
বলে কবি "হেন
বাক্য মোরে কেন?
বরিষা-নদীরে কেন আটকিয়া-রাখা!" ১২॥

এত বলি' সাহসে করিয়া ভর,
চলিল ঔদ্ধত্য পথে; আঁধার বাড়িল পর-পর।
তমো-পরাক্রমে
পড়ি' পথ-ভ্রমে,
নত-শিরে ধীরে-ধীরে ফিরে কবিবর॥ ১৩॥

বলে কবি "মানিলাম পরাভব!
দিকের ঠিকানা নাই কোন ঠাঁই, অন্ধকার সব!
না চড়িয়া গিরি
কেমনে বা ফিরি,
মূলেই যে পথ নাই ইহা অসম্ভব॥" ১৪॥

সাধু বলে "সাধু সাধু! বিধি বাম
নহেন তোমার প্রতি! সফল হইবে মনস্কাম
এইরূপ যদি
মনোবাঞ্ছা-নদী
শান্তিসিন্ধু-পানে ধায়, না জানি' বিরাম॥ ১৫॥

"অই দেখ ব্যাপি'-আছে বিঘ্ন-বন!
নিবসে হোতায় হিংস্র, জঘন্য, কুৎসিত, কুলক্ষণ,
পশু যত বন্য;
তাহারেই ধন্য—
উহা যে লঙ্ঘিতে-পারে প্রাণ করি' পণ॥ ১৬॥

"দুই পথ; একটির নাম শ্রেয়—
দু-ধার অরণ্যে ঘেরা; ধর্ম-বীর দুজন অজেয়,
শম আর দম,
ঘোর পরাক্রম,
দেখাইয়া দ্যা'ন্ তাহা; অন্য পথ প্রেয়॥ ১৭॥

"মিথ্যারে যে-জন জানে—এই সত্য,
প্রেয়ঃপথে চলে সে শান্তির আশে হয়্যে উনমত্ত।
একে লোকাকীর্ণ,
তাহে সুবিস্তীর্ণ,
অজ্ঞ-লোক নাহি জানে ফণীর সে গর্ত্ত॥ ১৮॥

"চলে মূঢ় প্রথমে উল্লাস-ভরে;
পরে যবে ভীষণ বন-গহন পথ-রোধ করে;
তমে লাগি' ধাঁদা
হয় যবে আঁধা,
মহিষ গুঁতায় কভু, ব্যাঘ্র কভু ধরে॥ ১৯॥

"শম-দম-তাপসের তপোবনে
আইস তোমায় আমি লয়্যে যাই, অতি সংগোপনে
হইবে যাইতে;
আইসে খাইতে
হিংস্র পশু অনেক দেখিলে যাত্রী-জনে॥ ২০॥

"পবিত্র সে তপস্বীর আবসথ
শ্রেয়ঃ পথের দ্বার! এই যে দেখিছ নামো-পথ
এই পথ-দিয়া
ক্রমে চলি'-গিয়া,
সেই পথে উঠি, হও সিদ্ধ-মনোরথ॥ ২১॥

"নিম্ন পথ দেখিয়া নূতন ব্রতী
মনে করে 'এ পথে চলিলে হয় রসাতলে গতি;'
কিন্তু তাহা ভুল!
নিম্নে এ'র মূল,
গতি উচ্চ-দিকে, নাম ইহার প্রণতি॥ ২২॥

"অই সে ঔদ্ধত্য-পথ, মহা-উচ্চ,
এই মাত্র যাহা আরোহিলে তুমি, ধরা করি' তুচ্ছ।
উহার শিখর
লভে যেই নর,
রসাতল দেখিয়া অমনি যায় মূচ্ছ॥ ২৩॥

"তাই বলি তোমায় প্রণতি-পথ
ধরি' চল'! এই সে বিজন পথ! লঙ্ঘে পরবত
পঙ্গু হেতা পশি'!
ভীরু ধরে অসি!
হেঁট হয়ে চল' সিদ্ধ হ'বে মনোরথ॥" ২৪॥

এত বলি' লয়ে-চলে শ্রেয়ঃকামে
নম্র পথে; দুয়ার এমনি ক্ষুদ্র, ডাহিনে ও বামে
এমনি প্রাচীর,
এমনি গভীর,—
উপরে গরজে ব্যাঘ্র, সাধ্য নাই নামে॥ ২৫॥

এইরূপে কিছু কাল দুইজন
চলিল প্রণতি-পথে; ঋক্ষ-বৃক-শার্দ্দূল-গর্জ্জন
যাইতেছে শুনা;
ভয় একগুণা
শত-গুণা হয়ে ভায়—এমনি নির্জ্জন॥ ২৬॥

অতঃপর শান্ত তপোবন-ভূমে
পদার্পিল যাত্রী-দোঁহে; মৃগ-পক্ষী মগ্ন সবে ঘুমে
রজনীর ছায়ে;
মন্দ মন্দ বায়ে
হেলিতেছে পাদপ, বিবর্ণ হোম-ধূমে॥ ২৭॥

সম্মুখে চাহিতেই দেখিল দোঁহে
যোগাসনে বসি'-আছে দু-জন; ভ্রম-প্রমাদ-মোহে
করি' খান্ খান্,
জ্ঞান-ভানুমান্
বদন উজ্জ্বল করি', অপ্রতিম শোহে॥ ২৮॥

তপত-কাঞ্চন-তনু, তেজোময়,
মনে হয় সহসা ভূতলে যেন তপন-উদয়।
ধ্যানে দিয়া ক্ষান্ত,
পবিত্র প্রশান্ত
নয়ন মেলিল তবে তপোধন-দ্বয়॥ ২৯॥

ঈষৎ হাসিয়া দুই তপোনিধি
প্রণত অতিথি-দোঁহে স্বাগত-সম্ভাষে যথাবিধি
করিল পূজন;
পরে সে দু-জন
বসাইল যাত্রী-দোঁহে আপন সন্নিধি॥ ৩০॥

সাধু-বাদ করিয়া কহিল দম
"এসেছ যখন এত কষ্ট লয়ে, বন অতিক্রম
অবশ্য করিবে;
কিন্তু বন্য জীবে
পথ-ঘাট হয়ে-আছে দারুণ দুর্গম॥ ৩১॥

"সুসঙ্গে পেয়েছ সঙ্গী ভাগ্য-বশে,—
নহিলে এ শ্রেয়ঃপথে সাধ্য নাই অন্য কেহ পশে;
দেখি' বিঘ্নারণ্য
হারায় চৈতন্য;
অবিনীত নর হেতা কভু না সাহসে॥ ৩২॥

"দুঃসাহস করে যদি লঘুচেতা;
মরীচিকা নামে এক রাক্ষসী হইয়া তা'র নেতা,
ফেলি'-দ্যা'য় ক্রমে
ঘোর পথ-ভ্রমে;
এ জনমে আর সে আসিতে নারে হেতা॥ ৩৩॥

"মনুষ্য আছিল যা'রা এক-কালে,
বন্য পশু হইয়াছে মরীচীর ঘোর ইন্দ্রজালে।
পশু হ'লে কাজে,
পশু-দেহ সাজে!
মনুষ্য তা'রেই বলি, ধরম যে পালে॥ ৩৪॥

"ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যদি,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর' আজিকে অবধি।
এসেছ হেতায়
যখন, বৃথায়
বহিয়া না যায় যেন জীবনের নদী॥ ৩৫॥

"বিঘ্নে ভয় পেয়ো না, ভুলো না ব্রত
লোভের কুহকে, শ্রেয়ঃপথে চল' মনুষ্যের মত।
বীর যে পুরুষ,
সত্য যে মানুষ,
ভয়-লোভে করে না সে মাথা অবনত॥ ৩৬॥

"বর্ম এই দিলাম তোমায় আমি,
ধৈরজ ইহার নাম; হও যদি শ্রেয়ঃপথ-কামী,
পর' ইহা অঙ্গে,
চল' সাধু-সঙ্গে,
প্রসাদ বিতরিবেন চরাচর-স্বামী॥" ৩৭॥

বলি', ধৈর্য-কবচ দিলেন, দম;
অঙ্গে কবি পরিল প্রণাম করি'; তা'র পরে শম
দিলেন পরশু;
বলিলেন, "পশু
যত আছে যেখানে, তা'দের ইহা যম॥ ৩৮॥

"ইহা জ্ঞান-পরশু, অনল-নিভ;
ইহারে সহায় করি', জন্ম-জন্ম ধর্ম পথে জীব'!
দেখিলেই পশু
ছোঁয়া'বে পরশু,
তিন বার উচ্চারিয়া শিব শিব শিব॥ ৩৯॥

"বৃথা কালাত্যয়, আর ভাল নয়!
উঠ' জাগ', হও সচেতন-যুবা, রিপু কর' জয়!
মৃত্যু-মুখ তর',
শ্রেয়ঃপথ ধর'—
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-ধার-সম পণ্ডিতেরা কয়॥" ৪০॥

কবিবর, জবলি' নব-অনুরাগে
পূজিয়া-মুনি-দোঁহার পদ-যুগ, আশীর্বাদ মাগে,
"কর' আশীর্বাদ
ভ্রম-পরমাদ
ছুটি' যায়; মন ধায় ধর্মপথ-বাগে॥" ৪১॥

"তথাস্তু" বলিল দুই মুনিবর;
সুসঙ্গের পশ্চাতে চলিল কবি, সাধন-তৎপর।
বলিল সুসঙ্গ
"আগে বন লঙ্ঘ',
তপোগিরি-শিখর আরোহ' তার পর॥" ৪২॥

এত বলি' পথ দেখাইয়া চলে;
দুই পদ না যাইতে মরীচী-রাক্ষসী মায়া-বলে,
চারু-চন্দ্রাননা
যেন সুরাঙ্গনা--
এমনি ধরিয়া রূপ, কাঁদি' কাঁদি' বলে॥ ৪৩॥

"কোথা গেলে প্রাণ-নাথ, দেও দেখা!
চারিদিকে বিজন গহন বন, নারী আমি একা!
দারুণ বিরহে
প্রাণ মোর দহে!
হায়! পোড়া-কপালে কি এই ছিল লেখা!" ৪৪॥

হেরি' বলে কবি "এ নহে মানবী!
দেব-কন্যা—নাহি ভুল! এমন সুন্দর মুখচ্ছবি
কভু কোন ঠাঁই
চক্ষে দেখি নাই!
রূপে আলো-করিয়াছে আঁধার-অটবী॥ ৪৫॥

"এলো-থেলো বেশ, এলো-থেলো কেশ।
এ'র যে এ দশা করে, সে মানুষ পাষাণ-বিশেষ
নাহিক সন্দেহ!
পারে কভু কেহ
দেখিতে, ধৈরজ ধরি', অবলার ক্লেশ!" ৪৬॥

হেন কালে দিব্য এক ছাগ-পশু
কাছে এ'ল; সুসঙ্গ অমনি বলে "পরশু পরশু!
পাইয়াছ বাগ,
বধ' এই ছাগ!"
পরশু-পরশে পশু তেয়াগিল অসু॥ ৪৭॥

চমকিয়া সম্মুখে দেখিল কবি,
যুবা এক পুরুষ হইল খাড়া, কনদর্প-ছবি।
প্রণমি' কবিরে,
পদ-ধূলি শিরে
লইয়া বলিল "মোরে ত্বরাও অটবী॥ ৪৮॥

"ও রমণী কাহ'কে দেখিলে কাঁদে!
কাহ'কে দেখিলে হাসে ঘোমটা টানিয়া মুখ-চাঁদে!
উহার কুহক
অতি ভয়ানক!
বড় বড় যোগী ঋষি পড়ি যায় ফাঁদে॥ ৪৯॥

"ভুলাইয়া মোরে ঐ মায়াবিনী
লয়্যে-গেল বনমাঝে, যেই ঠাঁই কামনা-কামিনী
আছে চক্ষু মেলি';
পাক-চক্র খেলি',
আইল আমায় দেখি' ধূর্ত্ত সে নাগিনী॥ ৫০॥

"বিষ-শ্বাসে এমনি হয়্যেছে বায়ু,
নাশায় পশিলে-মাত্র—দেহে যত শিরা যত স্নায়ু
করে অবসন্ন;
হয় অকর্মণ্য
সে জন, সে দিক্ দিয়া চলে যে অল্পায়ু॥ ৫১॥

"নাসায় পশিল যেই সে গরল,
ঢুলু ঢুলু হইয়া-আইল মোর নয়ন-যুগল।
ভুজঙ্গ-রমণী,
আমায় অমনি,
মায়া-নাগ-পাশে বাঁধি', করিল পাগল॥ ৫২॥

"অচেতন ছিলাম, জাগিয়া উঠি'
দেখিলাম—বনিয়া গিয়াছি ছাগ! করি ছুটাছুটি
ঘুরিয়া বেড়াই—
শান্তি নাহি পাই!
ক্ষুধা পে'লে পাতা খাই কুল-বৃক্ষ লুটি॥ ৫৩॥

"পশু-দেহ মোরে করাইল ত্যাগ
না জানি কোন্ দেবতা! আর আমি হইব না ছাগ
ভজি' সে পিশাচী!
যত দিন বাঁচি—
ক্ষালিব তাপাশ্রু-জলে পশুত্বের দাগ॥" ৫৪॥

শান্ত করি যুবাটিরে কোনো মতে
বলে সাধু "অধীনে আনিতে চাও যদি মনমথে—
ব্রহ্ম-আরাধনা
পরমা সাধনা।"
হেনকালে দস্যু এক দেখা দিল পথে॥ ৫৫॥

কুটিল ভ্রূভঙ্গে বলিল সে "লঙ্ঘে
এ বন কাহার সাধ্য? যে জন কবচ পরে অঙ্গে
সে কি আর মানুষ?
সে কাপুরুষ!
বাক্যালাপ করি না তাহার আমি সঙ্গে॥" ৫৬॥

এত শুনি' কবিবর রোষ-ভরে
কবচ খুলিতে যায়; সুসঙ্গ অমনি মানা করে;
বলিল "কি কর'
কি কর'! সম্বর'
রোষাগ্নি! বর্ম যে খুলে ব্যাঘ্র তা'রে ধরে॥" ৫৭॥

বলিতে-বলিতে এক বিপর্যয়
শার্দূল লম্ফিয়া-ধরি' কবিবরে, অধীরে গর্জয়;
নারিল হিংস্রক
দাঁত কিংবা নখ
বসাইতে, কবচ সে এমনি দুর্জয়॥ ৫৮॥

পরশন যেমন ছোঁয়াইল কবি,
পরাণ ত্যজিয়া ব্যাঘ্র চকিতে মনুষ্য-দেহ লভি'
দাঁড়াইল তথি
বীর-মহারথী,
তেজোময় মূরতি, প্রচণ্ড যেন রবি॥ ৫৯॥

বলিল সে "আমায় লইলে তুলি'
শ্রেয়ঃ-পথে—কে তুমি—কোন্ দেবতা! দেও পদ-ধূলি।"
কবি বলে "ছি ছি
কেন মিছামিছি
আমায় দিতেছ লাজ আপনারে ভুলি'॥ ৬০॥

"তৃণের নিকটে নোয়াইবে মাথা—
হেন মুদু করদমে গিরিবর রচে-নি বিধাতা।
জ্ঞানগর্ভ নব
কাহিনীটি তব
কহ যদি, চিরদিন হৃদে র'বে গাঁথা॥" ৬১॥

বলে বীর "উহার কথার ভঙ্গী
নেহারিয়া এমনি হইল ক্রোধ—শ্রেয়ঃপথ লঙ্ঘি'
উহার পশ্চাতে
তলবার-হাতে
ধাইলাম, ফেরুপাল হ'ল মোর সঙ্গী॥ ৬২॥

"ঘোর এক অরণ্যে পশিনু যেই,
উগ্রচণ্ডা নারী এক আসিয়া বলিল শুধু এই
দ্বিগুণ দ্বিগুণ
জ্বলুক আগুন!'
জ্ঞান হারাইনু আমি সেই মুহূর্তেই॥ ৬৩॥

"চেতন লভিয়া দেখি, হস্ত-পদে
চারিটা প্রকাণ্ড থাবা! আপনার গর্জন-শবদে
উঠিনু চমকি'!
অধিক ক'ব কি—
শত্রুও না পড়ে যেন তেমন বিপদে॥" ৬৪॥

এইরূপ কথায়-বার্তায় সবে
কিছুকাল চলিল শ্রেয়ের পথে বিনা-উপদ্রবে।
মরীচী-রাক্ষসী
সাজিয়া রূপসী,
সাজাইয়া পসরা বলিল মিষ্ট রবে॥ ৬৫॥

"কেগো যাত্রী তোমরা! কোথাকে যাও!
একটু জিরাও বসি', মোর ঠাঁই মিষ্ট কিছু খাও!
সরাসুর-প্রিয়
সুরা এই পিও,
স্বাদু মাংস, মিঠা ফল, খাও যত চাও॥" ৬৬॥

এত বলি কত মত ভক্ষ্য-পেয়
দেখাইল কবিবরে; তপস্বী যে যোগিকুল-ধ্যেয়,
তাহারো রসন
না মানে শাসন,
দেখে যদি সে-সকল দ্রব্য উপাদেয়॥ ৬৭॥

আসি' এক কুক্কুর চরণ লিহে
যাত্রি-জন-সবা'র, লাঙ্গুল নাড়ি' লালায়িত জিহে।
নানাবিধ ভক্ষ্য
করি' করি' লক্ষ,
কবির মুখের পানে তাকায় সস্পৃহে॥ ৬৮॥

পরশুর পরশে ত্যজিল কায়:
বাহির হইল এক নর-মূর্তি, গতায়ুষ-প্রায়।
লভিয়া মুকতি,
স্মরিয়া দুর্গতি,
চমকিত কবির পড়িল গিয়া পায়॥ ৬৯॥

বলিল সে "একেবারে পথ ভুলি'
পিশাচীর কুক্কুর হইয়াছিনু! লৈলে যদি তুলি',
সঙ্গে লয়ে-যাও;
পিতা অপেক্ষাও
পূজ্য তুমি আমার, বিতর' পদ-ধূলি॥" ৭০॥

সঙ্গে লয়ে তা'রে তবে কবিবর,
শ্রেয়ঃপথে চলিল সংযত-মনে, হৃষ্ট-কলেবর।
মরীচী-রাক্ষসী
ধরিয়া তামসী
দেবী-মূর্তি, কবিরে বলিল "মাগ' বর॥ ৭১॥

"এই সব অপসরা, সুমধ্যমা,
সুভ্রূ, সুলোচনা, চারু-হাসিনী, ত্রিলোক-মনোরম..
রমণী-রতন!
মনের মতন
দেখিয়া বাছিয়া-লও, সবে অনুপমা॥ ৭২॥

"এই দেখ আসিয়াছে দিব্য-রথ,
নয়নের একটি ইঙ্গিতে চলে যোজনেক পথ।
যেথায় বলিবে—
লইয়া চলিবে
তোমায়; তরিবে সিন্ধু, ডিঙা'বে পর্বত॥" ৭৩॥

অমনি প্রকাণ্ড এক অজগর
বক্র-গতি নিঃশব্দে আইল তথি; লাঙ্গুল উদর
দূরে আছে পড়ি'—
ক্রমে নড়ি' চড়ি'
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া হ'তেছে অগ্রসর॥ ৭৪॥

এগোইয়া—ঈষৎ হইয়া আড়,
লম্ফিয়া ধরিল আসি' কবিবরে উঁচা করি' ঘাড়।
প্রহারে প্রহারে
বাঁধিল তাহারে
কবিবর, ক্রমে ক্রমে করিয়া অসাড়॥ ৭৫॥

রুগন যুবক, লাগা'য়ে চমক,
বলিল "কি ঘোর অন্ধকার হ'তে তুলিনু মস্তক!
মৃত্যু-মুখে ছিল—
যা'-হতে বাঁচিল,
করিব, তাঁহারে সেবি', জীবন সার্থক॥" ৭৬॥

কবি বলে "কোনো মোর সাধ্য নাই।
চতুর-বরগ-ফল যাঁর হাতে তিনি সর্ব ঠাঁই।
তাঁরে বল ধন্য!
কি পাপের জন্য
দৈবের এ বিড়ম্বনা কহ মোরে তাই॥" ৭৭॥

বলিল রাজ-নন্দন "ও রাক্ষসী
এমনি জানে কুহক—হাতে মোর আনি-দিল শশী
বর-দান-চ্ছলে!
বচন-কৌশলে
তুলিল আমায় স্বর্গে মেনকা উর্বশী॥ ৭৮॥

"রথে যেই উঠিনু, সকলে মিলি'
চক্ষু মোর ফুটাইয়া হাসিতে-লাগিল খিলিখিলি।
বনের মাঝারে,
ঘোর অন্ধকারে,
বলে মোরে 'এই ঠাঁই থাক' নিরিবিলি॥' ৭৯॥

"গেল যেই আমায় ফেলিয়া অ্যাকা,
ধূমাবতী-মূরতি ডাকিনী এক দিল সেই দ্যাখা।
ডাকি' দুহিতারে
বলিল তাহারে
'উলূপী রে! পাতালের পথ এ'রে দ্যাখা'॥ ৮০॥

"অন্ধকার সকলি তাহার পর!
নাহি জানি মাথার উপর-দিয়া কত দিবাকর
অস্তে গেছে চলি'!
আজিকে কেবলি
জাগিলাম হইয়া প্রকাণ্ড অজগর॥" ৮১॥

এইরূপ কথোপকথন করি'
শ্রেয়ঃপথ-যাত্রী-সবে চলিল দণ্ডেক-দুই ধরি'।
রাক্ষস-রমণী
মরীচী অমনি
মায়া-গুণে বিরচিল বিচিত্র নগরী॥ ৮২॥

অশ্বারোহী আসিয়া সহস্রাধিক
সম্মুখ হইতে সরাইছে ভিড়, শাসাইয়া দিক্
শাণিত কৃপাণে;
আজ্ঞাকারি-ভাগে
সারি সারি দোধারি দাঁড়ায় পদাতিক ॥ ৮৩ ॥

বাজি'-উঠে শঙ্খ-ঘণ্টা ভেরী-তুরী,
বাহিরিয়া এ'ল সব বরাঙ্গনা উজলিয়া পুরী।
উঠিল অমনি
উলু উলু ধ্বনি,
পড়িতে লাগিল আর পুষ্প ভূরি ভূরি ॥ ৮৪ ॥

মরীচিকা সাজিয়া প্রধানা-রাণী,
হস্তে করি' মুকুট, কবিরে বলে প্রলোভন-বাণী;
"তোমার বিরহে
প্রজাগণ দহে!
ত্যজিলে তা-সবে তুমি কি দোষে না জানি ॥ ৮৫ ॥

"ত্যজিয়াছ আমায়—অদৃষ্ট মোর!
তাহে দুঃখ করিয়া কি করিব! প্রজার দুঃখ ঘোর
শুনি' দিবারাত্র
দহে মোর গাত্র!
প্রতিদিন রাজ-দ্বারে কাঁদে ক্রোর ক্রোর ॥ ৮৬ ॥

"দুখ-নিশি তা'দের কর'-সে ভোর,
মুকুট পর' মাথায়! একটি বচন রাখ' মোর!
নহিলে তোমার
চরণে এবার
ত্যজি' প্রাণ, এড়াইব যন্ত্রণা কঠোর ॥" ৮৭ ॥

আইল মহিষাসুর মূর্তিমান্
কৃষ্ণকায় যেমতি যমের বৃষ—বিকট-বিষাণ।
কবিবরে যেই
আক্রমিল,—সেই
পরশুর পরশেই ত্যজিল পরাণ ॥ ৮৮ ॥

মহিষ হইল যেই গত-শির,
দোরদণ্ড-প্রতাপ মহীশ এক হইল বাহির!
বলে লোক-প্রভু
"কারো কাছে কভু
তিল-মাত্র নোয় নাই যাহার শরীর, ॥ ৮৯ ॥

"সেই আমি তোমার চরণে নত
হইনু—যে হও তুমি!" কবি বলে হইয়া বিব্রত
"তুমি জন-স্বামী
তৃণ-তুল্য আমি,
মোরে নোয়াইলে শির, এ কি অসঙ্গত!" ৯০ ॥

নৃপ বলে "রাজ-ঐশ্বরিজ-ভোগ
ছাড়িনু আজি-অবধি! অরণ্যে সাধিব আমি যোগ!
বিপদ্ যে গুরু—
সে-ই মোর গুরু,
সম্পদ অপরিমেয়—সে-ই মোর রোগ ॥ ৯১ ॥

"দিগ্বিজয় করিতে বাহিরিলাম,
দেখিলাম কত দেশ-বিদেশ, কত নগর-গ্রাম!
অই নারী শেষে,
রাজরাণী-বেশে,
দর্শন মাগিল মোর, ভাঁড়াইয়া নাম ॥ ৯২ ॥

"দূত-মুখে বলিল 'যদিও আমি
রাজরাজেশ্বরী, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ হারাইল স্বামী।
এ মোর যৌবন
চারু পুষ্পবন
হ'তেছে প্রখর-তাপে ধরাতল-গামী ॥ ৯৩ ॥

"'শুনিয়া তোমার দিগ্বিজয়ী নাম—
আমা-সনে আমার ঐশ্বর্য যত, যত পুর-গ্রাম,
যত রত্ন-রাজি,
যত গজ-বাজী,
সঁপিবারে এস্যেছি, পুরাও মনস্কাম ॥' ৯৪ ॥

"সসাগরা ধরার হইয়া স্বামী,
আশ মিটিল না মোর—ডাকিনীর হৈনু অনুগামী!
লয়ে বন-মধ্যে,
পাত্র পূরি' মদ্যে,
হস্তে দিল আমার; পি'লাম তাহা আমি॥ ৯৫॥

"পাত্র যেই মুখে দিনু মদ-ভরা,
সরা-সম নিরখিতে লাগিলাম সসাগরা ধরা।
ক্রমে ক্রমে বিশ্ব
হইল অদৃশ্য;
পঙ্কে রহিলাম পড়ি' হয়ে আধ-মরা॥ ৯৬॥

"রাত্রি-শেষে লভিনু যবে চৈতন্য,
চমকিয়া দেখিলাম, চতুষ্পদ হইয়াছি বন্য!
পাইলাম শিক্ষা।
এবে চাই ভিক্ষা—
অনুযাত্রী-দল-মাঝে কর' মোরে গণ্য॥" ৯৭॥

"কি বিষম মতিভ্রম!" এত বলি
চলিলেন ক্ষিতিপতি অহঙ্কার পদতলে দলি।
বিনা উপদ্রবে
কিছুকাল সবে
চলিল শ্রেয়ের পথে তিলেক না টলি'॥ ৯৮॥

মরীচিকা সাজিয়া কুব্জা-বুড়ি,
বলিল, "হায় রে বিধি! তুড়ি-দিলে যায় যা'রা উড়ি';
সেই সব লোক
কাঁপায় ত্রিলোক!
গুণী-লোক মনাগুনে মরে জ্বলি' পুড়ি'॥ ৯৯॥

"জ্ঞানী মানী তোমরা এমন-ধারা,
হায় রে! তোমরা আজ পথে-পথে হইতেছ সারা!
গরুবে-সবার
আঁতে ঘা দিবার
মন্ত্র এক শেখ'সে শেখ'সে বাণ-মারা॥" ১০০॥

হেন কালে ফোঁস্ করি' কেউটিয়া
ঝোপের ভিতর হ'তে দ্রুত-বেগে আইল ছুটিয়া
তড়িতের প্রায়!
পরশুর ঘায়
পড়িল অমনি দুষ্ট, ফণা উলটিয়া॥ ১০১॥

বাহির হইল এক বাক্যবাজ—
বড় জনে ছোট করা ভবে যাঁর সবে-মাত্র কাজ।
লজ্জানত শিরে
বলিল কবিরে
"মরিতেছিলাম বিষে বাঁচিলাম আজ॥ ১০২॥

"পথ-হারাইয়া আমি, বিঘ্ন-বনে
বিচরিতেছিলাম, সহসা ওই ডাকিনীর সনে
দেখা হ'ল মোর,
কি যে এক ঘোর
মন্ত্র ফুসলিয়া-দিল আমার শ্রবণে—১০৩॥

"চকিতে হইনু আমি কাল-সাপ!"
এত শুনি' বলিলেন সুসঙ্গ "মাৎসর্য মহাপাপ!
আত্ম-পর উভে
সম শুভাশুভে;
পরের মঙ্গলে তবে কেন পাও তাপ! ১০৪॥

"মগ্ন যেই পরের অশুভ-ধ্যানে,
মিঠা-বাক্যে হো'ক্ না সে কামধেনু, কল্পতরু দানে,—
ধরুক্ না, সাপ,
পাঁচ-রঙা ছাপ—
চরাচর তবু তা'রে শত্রু বলি জানে॥" ১০৫॥

কবি কহে "কাহারে দুষিবে কেবা, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর—
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ ছার ভব-ধামে?
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে! ১০৬॥

"চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়-মুষ্টি কর!
পদ-প্রসারিতে-মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর!
এ করিছে গর্জন, ও কাঁপে থর-থর, এর মুখ
ভ্রূ-কুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক! ১০৭॥

"এ'র অভিমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি',
সাধ-যায় চরাচর পদতলে যা'ক্ গড়াগড়ি!
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত,
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত॥ ১০৮॥

"কিন্তু কোথা হেন মন, কিছু যা'তে নাহি ফের-ফার?
কোথায় সে মন, যা'র আছে বোধ—হৃদয় সবার
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান॥" ১০৯॥

সুসঙ্গ বলিল "ধন্য! সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে!
চিরজীবী হয়্যে থাক', ধরণী পূরুক্ তব নামে!
চূড়া হও দেশের, কুলের হও জ্বলন্ত মাণিক,
ধর্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল' দশ দিক্! ১১০॥

"শান্তি-দেবী শিয়রে থাকুন জাগি', আশীর্বাদময়
নয়ন-পঙ্কজ মেলি,' নিদ্রা যাও তুমি যে-সময়!
সুমঙ্গল শান্তি আর হউন তোমার পার্শ্ব-চরী
শয্যা-হ'তে বাহিরও যেই-কালে নিদ্রা পরিহরি' ১১১॥

"—প্রেম-তৈলে হৃদয় ভরা'ন্ যবে হৃদয়-অধিপ,
তত্ত্ব-আলো জ্বালিবারে ভাল যাহা, শয্যার প্রদীপ
নিভ'-নিভ' হয় যবে; যবে আর আসি' ধীরে ধীরে
মৃদু হাসে অরুণ, ইঙ্গিত করি' ক্ষীণাঙ্গী-নিশিরে—১১২॥

" 'এই বেলা পড়' সরি'; পরে বলে 'কর্য়ো না আড়াল,
ঝাঁট-দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এ সব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক-বাঞ্ছিত-দরশন!'
সারা বিশ্ব করুক্ তোমার হৃদে শান্তি-বরিষণ! ১১৩॥

"কবি তুমি—কিসের দুঃখ তোমার, ব্যথা পে'লে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার' বেদনা, জগত-জন-কানে!
যাহা শুনি' অশান্ত নিতান্ত যে বালক—খেলা ত্যজি'
সে-ও বসে শান্ত হয়ো! সে-ও তা'র ভাব-রসে মজি'॥১১৪॥

"আপন কাজল-আঁখি করয়ে সজল! যেইরূপ
নীল-সরসিজ-দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ্ টুপ্
যখন যামিনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায়-চুম্বন দ্যা'ন্ তাহারে সজল-আঁখি সহ॥ ১১৫॥

"হ'লে সুখী, প্রভাত ডাকিয়া-আন' আঁধার নিশীথে!
কোকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহু কন-কনি শীতে!
প্রকৃতিরে এমনি করেছ বশ—হৃদয়ের ধন
ঢালি-দিয়া, হেলায় করিতে পার অসাধ্য-সাধন! ১১৬॥

"সাজাইয়া-আনিয়া নব বসন্ত—মাধুরীতে ভোর,
দাঁড়-করাইতে পার' অকাতরে দুরন্ত কঠোর
শন-শন-স্বন-কারী শিশিরের মুখের সম্মুখে!
অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে! ১১৭॥

"চিরকাল তুমি, অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়—
ডরে না ঝড়ে-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়, ১১৮॥

"আপনে আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা!"
কবি কহে "এতক্ষণ জড়-সড় ছিল মোর পাখা,
স্নেহ-রূপ অমৃতের ছিটায় জড়তা হ'ল দূর!
চরণ এখন দেও, তৃপ্তি-রস দিয়াছ প্রচুর!" ১১৯॥

এত বলি' সুসঙ্গের পদ-দ্বয়
ভাসাইল অশ্রু-জলে; পাদ-পদ্ম-তৃষিত হৃদয়,
ভক্তি-রসে গলি'
পড়িল উথলি',—
ছাড়িতে চাহে না আর তেমন আশ্রয়॥ ১২০॥

যাত্রী সবে করিয়া অভয় দান,
স্ব স্ব গৃহে বিদায় করিল সাধু করুণা-নিধান।
লয়ে কবিবরে
যত্ন সমাদরে
সানুদেশ আরোহিয়া কহিল সন্ধান॥ ১২১॥

"শুনহ সন্ধান, করি' প্রণিধান!
বামে স্পর্ধিছে ভিত, ডানি-দিকে পাতাল-ব্যাদান
মধ্য-দিয়া পথ,
বাহিয়া পর্বত,
পেঁচাইয়া চলিয়াছে ফণীর সমান ॥ ১২২॥

"দ্বন্দ্ব-নামে বিখ্যাত উভয় পাশ,
বামে কাল-দণ্ড উঁচা, ডাহিনে ভীষণ-কাল-গ্রাস।
নিরখিলে মাত্র
শিহরায় গাত্র,
কিঞ্চিৎ অনবধানে ঘটে সর্বনাশ! ১২৩॥

"মধ্য ঠাঁই সরু-পথ, নাম সাম্য;
উন্নতি, সোপান গঠিয়াছে তায়, সাধুজন-কাম্য!
উচ্চে যদি ওঠ',
পৃথ্বী হ'বে ছোট,
স্বর্গের মন্দার হ'বে করতল-নাম্য॥ ১২৪॥

"হেম-দণ্ড এই যে দীপ্তিমান,
ধরম ইহার নাম, ধর' ইহা, ইহার সমান
নাহিক আশ্রয়;
দ্বন্দ্ব করি' জয়
আরোহ' আমার সনে পর্বত মহান্॥" ১২৫॥

অতঃপর একের পশ্চাতে অন্য
চলিল পর্বত-পথে, দূর-হৈতে নাহি হয় গণ্য।
উচ্চে যত উঠে,
ভ্রম তত ছুটে,
শিখর লভিল যেই লভিল চৈতন্য॥ ১২৬॥

খুলি-গেল দিগন্ত সকল-দিকে;
পর্বত-পাথার-ব্যোম দেখা দিল একে নিমিখে!
কবি কুতূহলী,
অচল পুত্তলি,
বলিল "কি স্বর্গ-ভোগ আঁখির আজিকে! ১২৭ ॥

"সুদূর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রম-শান্তি-সুধা পানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার-স্নেহে ঢালি'-দিয়া বুক
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥ ১২৮ ॥

"শূন্যে করে চন্দ্র-তারা জ্যোতির সঞ্চার।
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় আছে পড়ি' কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥ ১২৯ ॥

"পৃথ্বী ছাড়ি', আইলাম এ কোথায়!
সাগর কাঁপিছে দূরে, জ্যোৎস্নায় দিব্য দেখা-যায়!
কি সুন্দর বায়—
সন্তাপ নিভায়—
আহুহু! মুক্তি যেন হেতা মূর্তিমতী ভায়॥" ১৩০ ॥

হেন-কালে আইল আরেক দল
শান্তি-নিকেতন-যাত্রী: লভিয়া অজেয় ধর্ম-বল
আনন্দ-ভূপতি
হরষিত মতি
আরোহিল ধীরে-ধীরে পুণ্য তপোচল॥ ১৩১ ॥

বীর আর কল্যাণ আইল সঙ্গে;
এ দোঁহার সহায়ে আনন্দ-রাজ বিঘ্ন-বন লঙ্ঘে।
প্রমদা, কল্পনা,
শোভা, তিন জনা
সঙ্গিনী, সমস্ত পথ কাঁপিল আতঙ্কে॥ ১৩২ ॥

সুসঙ্গে আনন্দে বহু-কাল সখ্য;
দূর-হৈতে দুই-জন দোঁহারে করিল যেই লক্ষ,
আনন্দের দ্বার
খুলি'-গেল আর!
এক ঠাঁই হইল দোঁহার দুই বক্ষ! ১৩৩ ॥

হর্ষ-ভরে আনন্দ-ভূপতি কয়
"কত-দিন এ সুদিন জাগি' জাগি' হইয়াছে লয়
মনের ভিতর!
তপ্তের উপর
আজি এ শীতল-ধারা অতি মধুময়॥" ১৩৪ ॥

বরষিল দোঁহার প্রেমাশ্রু-ধারা!
এ-দোঁহে যেমন সখ্য, দেখিয়াছে কে এমন ধারা!
বলিল সুসঙ্গ
"জুড়াইল অঙ্গ,
নেত্রে আজি উদিল সুখের শুক-তারা॥ ১৩৫ ॥

"প্রেম-ডোরে তোমার এমনি বাঁধা
এ হেন হৃদয় মোর; নয়ন থাকিতে হই আঁধা
অদর্শনে তব,
বিচিত্র এ ভব
প্রহেলিকা মনে হয় চিত্তে লাগে ধাঁদা॥ ১৩৬ ॥

"বহু-দিন সৌরভের দেখা নাই যেই পুষ্প-সনে,
শুষ্ক-কণ্ঠ মধু-হীন যেই-পুষ্প কাঁদে নিরজনে,
তা'রো হয় শুষ্ক-মুখ আনন্দের হাসিতে সরস,
মলয়-সমীরণের পায় যবে কোমল পরশ॥ ১৩৭ ॥

"আজি মোর তেমনি সৌভাগ্য জেন্যো!
সঙ্গে নারী-সবে এ'রা, রূপে-গুণে দেবকন্যা যেন,
এত পরিশ্রমে
বিঘ্ন-অতিক্রমে
এ'লেন, বসুন্ সবে, দাঁড়াইয়া কেন?" ১৩৮ ॥

আনন্দের চরণ-যুগে নমিল কবিবর,
বলিলেন আনন্দ-ভূপ “এত দিনের পর,
কলপনা তোমার হ'বে চির-দিনের তরে,
যা'র লাগি' ফিরিলে তুমি দেশ-দেশান্তরে॥” ১৩৯॥

সবে মিলি', বসিল তবে, ঘেরিয়া সাধু-বরে;
আনন্দেরে বলিল সাধু “এ হেন গিরি-পরে
আরোহিলে কি মনে করি', বল' তাহা আমায়।
এই সকল ভীরু নারী, চকিত-মৃগী-প্রায়, ১৪০॥

“এত পথ আসিয়াছেন? কোমল অবলার
নিরখিয়া ধরম-নিষ্ঠা মনে লয় আমার,
শূর-বীর পুরুষ-বর জগতে যত আছে
উপদেশ পাইতে-পারে নারী-জনের কাছে॥” ১৪১॥

বলিলেন আনন্দ-ভূপ হেন বচন শুনি'
“সংসার-ব্রতে ব্রতী হ'বে এ-সকল তরুণী,
তাহার আগে পাওয়া চাই ধরম-উপদেশ,
তেঁই হেতায় আগমন সহিয়া এত ক্লেশ॥ ১৪২॥

“বীরের হস্তে সঁপি'-দিয়া বিলাসের শাসন
প্রমোদেরে ছাড়িয়া-দিনু রাজ-সিংহাসন।
এই ঠাঁই আসিব বলি' হইলাম উদ্যোগী;
রটিল দেশ-দেশান্তরে, হয়েছি আমি যোগী॥ ১৪৩॥

“হেন-কালে করুণা মোরে দিলেন দরশন,
বলিলেন 'করিবে যদি অচল আরোহণ,
এই প্রমদা-যুবতীরে লইয়া-যাও সঙ্গে;
বীরের যেন বাহু-বলে বিঘ্ন-বন লঙ্ঘে॥ ১৪৪॥

“ঋতুরাজ ইহার পিতা, তাহার প্রতিনিধি
হইয়া তুমি বীর-সঙ্গে ইহার যথাবিধি
বিয়া দিবে; তোমার কন্যা শোভা ও কল্পনা
দোঁহে লও আপন সঙ্গে, বিলম্ব কর্য়ো না॥ ১৪৫॥

"পতিত্বে বরিয়াছে দোঁহে মনে-মনে, যখন,
কল্যাণ আর কবিবরে, ভাল নয় তখন
বিবাহ-দানে কাল-ব্যয়; তপোগিরি-শিখরে
আরোহিবে আজিকে কবি রজনীর ভিতরে॥ ১৪৬॥

"শম-দমের তপোবনে কল্যাণ পড়ে-শোনে,
সে-ও আজি হউক্ সুখী অচল-আরোহণে।
পথ দেখায়ে তোমা-সবে লয়ে-যা'বে সে জন,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে হ'লে তাহারে প্রয়োজন॥ ১৪৭॥

"শোভা হউক্ কল্যাণের, কলপনা কবির,
প্রমদা-রমণী-রতনে ভূষিত হো'ক্ বীর।
সুসঙ্গ সবারে দিবেন জ্ঞানের উপদেশ,'
এই আজি আমার প্রতি হ'ল প্রত্যাদেশ॥" ১৪৮॥

সুসঙ্গ বলিল তবে যাত্রি-সবে
"এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর', সিদ্ধি-লাভ হ'বে।
হয়ে উপবিষ্ট
হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে॥" ১৪৯॥

কবি কহে "দেব-স্পৃহণীয় শান্তি
কেমনে পাইব বল' কৃপা-করি' ঘুচাইয়া ভ্রান্তি;
'শান্তি শান্তি' করি
দিবা-বিভাবরী,
হাত-পা আছাড়ি' শুধু সার হয় শ্রান্তি॥" ১৫০॥

সাধু বলে "সুমতি যেমন মনে
তেমতি না কর' কাজ, ফল-লাভ হইবে কেমনে?
অচেত অধম,
বিলপে মধ্যম,
সেই সে উত্তম যেই আচরে যতনে॥ ১৫১॥

"কর্তব্য কি মনুষ্যের—শুন' সবে,
গৃহীজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হ'বে।
ধর্মে হ'বে রত
অধর্মে বিরত,
ব্রহ্মে সব সঁপিবে, করিবে যাহা যবে॥ ১৫২॥

"পরব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
অনায়াসে তরি' যাবে, ভয়াবহ সংসার-সাগর।
তাঁরে প্রীতি কর',
তাঁরি ধ্যান ধর',
বিচর' তাঁহার পথে ধরম-দোসর॥" ১৫৩॥

সুসঙ্গের উপদেশে করি' ভর
ধ্যান ধরি', চক্ষু-দুই মেলিল যেমন কবিবর,
দেখিল অমনি,
দ্যুলোক-রমণী
শান্তি, আলো-করি' আছে বিশ্ব-চরাচর॥ ১৫৪॥

চারিদিকে দেব-দেবী অগণন
পারিজাত-গন্ধে মনে জাগাইয়া নন্দন-কানন,
ছিটায়ে নির্মল
মন্দাকিনী-জল,
পুলকিত করি'-তুলে সবার আনন॥ ১৫৫॥

"প্রণম' শান্তির পদে দুঃখ যা'বে"
বলিয়া সুসঙ্গ প্রণিপাত করে গদগদ-ভাবে।
প্রণমিল কবি
পুলকিত-চ্ছবি,
লভিল পরম-পদ পাদ-পদ্ম-লাভে॥ ১৫৬॥

অঙ্গে পেয়ে মন্দাকিনী-জল-সঙ্গ
অন্তরে অমর হ'ল কবিবর, ভয় হ'ল ভঙ্গ।
পাপ-তাপ-ক্লেশ
সব হ'ল শেষ,
মুখ-চক্ষু ধরি'-উঠে নব এক রঙ্গ॥ ১৫৭॥

হৃদি-মাঝে পাইয়া চেতন-রবি,
ফুটিল নয়ন-পদ্ম! "দ্বিজ হৈনু" মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্ম-তালু ভেদি'
ভব-পাশ ছেদি',
উঠে জ্ঞানানল-শিখা হিরণ্ময়-ছবি॥ ১৫৮॥

এমনি তাহার জ্যোতি সুবিমল!
নয়নে না দেখা যায়, দেখা-যায় চেতনে কেবল।
জড় অঙ্গ-চয়
হইল চিন্ময়,
ইন্ধন যেমন হয় অনলে-অনল॥ ১৫৯॥

ধরাতল রসাতল নভস্তল,
আনন্দে আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণন বিফল।
জ্ঞানাঞ্জন মাখি'
লভে দিব্য-আঁখি,
লভে ব্রহ্ম-সহবাসে কোটি পুণ্য-ফল॥ ১৬০॥

পুণ্য-লোক হইতে এলেন সত্য,
পদ পূজি' তাঁহার দেবতা-গণ করে আনুগত্য।
আইলেন ধর্ম,
আইলেন শর্ম,
দেব-লোকে দোঁহার যুগল আধিপত্য॥ ১৬১॥

আইলেন শ্রী হ্রী ধী করুণা ক্ষমা!
আইলেন ভগবতী পরা বিদ্যা, দ্যুতি অনুপমা!
শ্রদ্ধা নামে সতী
সত্য যাঁর পতি,
আইলেন! প্রীতি আর সুন্দরী পরমা! ১৬২॥

বলিল, আনন্দ-ভূপ, দিক্‌পালে
"কন্যা-গণ আসুন্! করিব আমি পুণ্য এই কালে
করতব্য যাহা!
অই তাঁরা—আহা—
সুভূষা যেমন ঊষা পূরব-আড়ালে! ১৬৩॥

"হও এ'স সংসার-ধরমে ব্রতী।
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা-ললনা,
শোভা, কলপনা,
এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী॥ ১৬৪॥

"সত্য-দেবে দাঁড়াও সম্মুখ-করি';
বল' 'প্রভু তুমি সাক্ষী, নাশ' বিঘ্ন প্রসাদ বিতরি'।
স্মরি' সত্য নাম
করহ প্রণাম,
বল' 'তব পদ-যুগ ভবার্ণবে তরী'॥" ১৬৫॥

অতঃপর ফিরাইয়া দুই পক্ষ
মুখা-মুখি দাঁড়-কবাইল ভূপ যাহে যা'র লক্ষ।
শুভ সম্প্রদান
করি' সমাধান,
সু-মুহূর্তে বাঁধি'-দিল জীবনের সখ্য॥ ১৬৬॥

দেবলোকে যেমন বিবাহ-বিধি
সেইরূপে কন্যাদান করিল আনন্দ সুধা-নিধি।
প্রমদা-ধনীরে
সঁপি দিল বীরে
ঋতুরাজ ভূপতির হ'য়ে প্রতিনিধি॥ ১৬৭॥

মিলি' সব দেবতা পর্বত-শিরে,
আরম্ভিল পরমব্রহ্মে স্তব রজনী-গভীরে।
ভুবন ভরিয়া
মোহিত করিয়া
উঠে গীত, শুনে কবি লোমাঞ্চ শরীরে॥ ১৬৮॥

"জয় জয় পরব্রহ্ম
অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি
প্রেমের আকর-ভূমি
মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥

নানারসযুত ভব
গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি আদিকবি
ছন্দে উঠে শশিরবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-ভাতি
জ্বলদ্-অক্ষর-পাঁতি,
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে
মহিমা কীর্তন করে,
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে॥
কুসুমে তোমার কান্তি,
সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি
(কি জানিবে মূঢ়মতি)
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম॥

"আনন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে
কোটি সূর্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারই এ রচনারই
ভাব ল'য়ে নরনারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা॥
মিলি সুর নর ঋভু
প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব-মঙ্গল আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম
দেও ভক্তি দেও ক্ষেম
দেও দেও ও পদ-আশ্রয়॥"

নিশি অবসানপ্রায়
সুখে সবে নিদ্রা যায়
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চায়।
ঘা দিয়া হৃদয়-মাঝে
মঙ্গল আরতি বাজে—
পুণ্যগন্ধী সমীরে নাচায়॥
এ হেন সময়ে কবি
উঠিল চেতন লভি,
বাহিরিল বাহির-উদ্যানে।
নিঃশব্দ-তরঙ্গবতী
চলে গঙ্গা ভাগীরথী
ধীরে ধীরে সাগরের পানে॥

স্নিগ্ধ কিবা এই কাল,
নাহি কোনো গোলমাল,
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়।
ঝোপঝাপ অন্ধকার,
নভস্তল পরিষ্কার,
লতাপাতা হিমবিন্দুময়॥
শশী অস্ত যায়-যায়,
কি দুর্দশা হায় হায়,
কেবা তার দুরবস্থা দ্যাখে।
এমন যে বন্ধু তারা,
স্বচ্ছন্দে এখন তা'রা
তা'রে ফেল্যে যায় অ্যাকে অ্যাকে॥
শাখাপত্র ঢুলাইয়া
জলপুঞ্জ ফুলাইয়া
বুলাইয়া মাঠ-ময়দান
মন্দ মন্দ বায়ু বহে,
কবি মনে মনে কহে
"আহা কি সুন্দর এই স্থান!"॥

স্বপ্ন-প্রয়াণ

(সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দ)

।　　　।　　　　।　　　　।
বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে।
।　　　　।　　　　।　　　　।
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে॥
।　　　　।　　　।　　　।
মত্ত মধুপায়িদল ধাইল ত্বরা করি।
।　　　　।　　　　।　　　　।
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী॥

আলোচনা

বাংলাসাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের সূর্যাস্তবর্ণ-বিলাসে, বনান্ধকারে, শৈলপ্রাকারে, নিজের অধ্যাত্ম-আনন্দের স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে—এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই। বাস্তবিক সেকালের অন্যান্য কবিতার পার্শ্বে স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানিকে ধরিয়া দেখিলে অনেক কথা মনে হয়। ম্যাথু আর্নল্ড কবি গ্রের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, গ্রে একজন সুন্দর কবি ছিলেন, কিন্তু পোপ্-ড্রাইডেনের গদ্যময় যুগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বেশি কবিতা লিখিতে পারেন নাই—তাঁহার শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব চারিদিকে গদ্যের চাপে প্রচুর-রকমে উৎসারিত হইতে পারে নাই। এই উক্তিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটি ছবি জাগিয়া পড়ে। মনে হয়, যেন চারিদিকে একটা ধূম্রমণ্ডল—দূরে এক কোণে কোথায় একটি কিংশুকবর্ণ জ্যোতিঃশিখা কাঁপিতেছে, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—এখনো তাহাকে কেহই দেখিতেছে না। বাস্তবিক জন্‌সন্ গ্রেকে সরাসরি 'barren rascal' বলিয়াই সমালোচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

সেকালের কবিতার অনেক গুণ থাকিতে পারে—কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি হইতে যে একটি মধুর রঙিন জ্যোতি বাহির হইয়া আসিতেছে, স্বপ্ন-প্রয়াণের মধ্যে যে একটি জীবনের আন্দোল-লীলা দেখিতে পাই, এবং এই কাব্যের ভাষায় যে একটি অপূর্ব নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের চিত্ত আনন্দের রশ্মিঘাতে জাগিয়া উঠে, একটি বিরল কবিত্বলোকের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়—ইহা সেকালের অন্যান্য কবিতায় প্রায় একেবারে দুর্লভ।

চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই স্বপ্ন-প্রয়াণে প্রথমত চোখে পড়ে। অনেকের লেখা যেন বিমর্ষ ভাবে শুইয়া থাকে। পাঠক তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া, পাঠক তাহাতে নিজের কল্পনা প্রয়োগ করিয়া—তবে কোনোমতে ভাবটাকে জাগাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। আবার কোনো কোনো লেখায় বেশ ভদ্রলোকের মতো পাঠকের সঙ্গে হাতাহাতি চলিতে থাকে—যতই সুন্দর, যতই গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করা তাহার উদ্দেশ্য হউক কথাবার্তাটি বেশ ভব্যরকমের। আর-এক-রকম লেখা আছে, যেখানে পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, অনেকগুলি শুষ্ককথার জাল ঘুরিয়া-ফিরিয়া তবে একটি চিত্র উদ্‌ভাসিত হয়। কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব অথচ চিরপরিচিত চিত্ররাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না, চিত্রই জাগিয়া উঠে। যেখানে বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে। এইরূপে আদ্যোপান্ত মনটি সজাগ হইয়া বসিয়া থাকে এবং অবিরাম একটি বিচিত্র জীবনের আনন্দে মাতিতে থাকে।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ—
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী আইল অমনি।—

এই প্রথম তিন ছত্র পড়িতেই বোধ হয় যেন দৃশ্যপটের উপর অস্তগামী তপনের বর্ণচ্ছটাকে অনুসরণ করিয়া একটি গভীর স্বপ্নাবেশ চক্ষের উপরে আসিয়া আবির্ভূত

হইতেছে। ক্রমে—

ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি,
আঁচল ধরায় পড়ে লুটি—

এইরূপ গমনে স্বপ্ন আসিয়া দু-চার ছত্র পরে যখন একটি পদ্মফুল—
বুলাইল কবির মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে—
তখন আবেশটি আরও নিবিড় হইয়া উঠে। ক্রমে দেখা যায়, সমস্ত প্রথম প্রয়াণটি ব্যাপিয়া কেমন একটি শিথিল, লুণ্ঠিত, অলস ও একটি স্তম্ভিত-বিস্মিত ভাবের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এতখানি বলা হইল। কিন্তু সকল স্থলেই এইরূপ—যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবের আশ্চর্যরকমে, পরিপূর্ণরকমে উদ্‌বোধন দেখা যাইবে। বহির্জগতের এত চিত্র, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বাংলার আর কোনো কাব্যেই নাই। শব্দের এমন ক্ষমতা যে, উচ্চারণমাত্র চক্ষে চিত্র উপস্থিত হয়, যথা,
নদী—

সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'!

ফোয়ারা—

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি-উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল, ছাড়ি' দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা।

সুরভি মন্দানিল—

আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির।

ভাঙা-দালানে বায়ু—

জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায় বলি 'সর্ সর্'।

পাতাল—

শ্রবণপ্রবণ গহ্বরভবন

টুঁশব্দটি হইলেই তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্ করি' কাড়াকাড়ি।

ইত্যাদি। এইরূপ প্রতি ছত্রে। শুধু বাস্তব নহে, মনের একেকটি ভাবও অপূর্ব কাল্পনিক চিত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। যেমন—মনোরাজ্যের নামে কবি আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব অপসরা!
দলি স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু!
কল্পতরুছায়াতলে রঙ্গে হাসে ধরা।

এই শ্লোক কালিদাস লিখিতে পারিতেন। এই শ্লোকে আনন্দের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য

অলকাপুরীর চিত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইটি আবার বিশেষ করিয়া বারবার বলি যে, এইরূপ চিত্র যে শুধু একটি দুটি হঠাৎ এখানে-ওখানে পাওয়া যায়, তাহা নহে, এইরূপ চিত্রাবলী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। বাস্তবিক, স্বপ্ন-প্রয়াণ ব্যক্তিত্ববিহীন গভীর ভাব-উদ্‌বোধনেরই কাব্য—মানবের অধ্যাত্মজীবনের একটি পরিণতিক্রমই ইহাতে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। প্রথম সেই অধ্যাত্মরাজ্যের পরিণামক্রমটি মনের মধ্যে স্থির করিয়া ধরা; ক্রমে বহির্জগতের যথাযথ চিত্রে সেইটিকে পরিস্ফুট করা, মনোভাবের ভূতগুলিকে যাদু করিয়া মানুষ-মানুষীবেশে নদীকান্তারগিরিবনে পরিভ্রমণ করানো; চিত্রের যথাকাল ও যথাভাবগুলিকে অনুরূপ ছন্দের লীলায় প্রকাশ করিয়া তোলা; এবং ছন্দগুলিকে সজীব ও উজ্জ্বল শব্দমালায় গাঁথিয়া উঠানো—এইরূপে স্বপ্ন-প্রয়াণের আদ্যোপান্তই একটি অতি উজ্জ্বল পরিস্ফুটনক্রিয়া চলিয়াছে। এই অপগুণ, পরিপূর্ণ পরিস্ফুটনক্রিয়াটির মধ্যে একটি অসাধারণ মনঃশক্তির বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। এই মনটির কল্পনা-সম্পদ্, ছন্দসম্পদ্ ও ভাষাসম্পদ্ সাগরের মতো অশেষ। ইহার অনুভাব—গাম্ভীর্যেরই হউক আর সৌন্দর্যেরই হউক—ইহার অনুভাব এবং প্রকাশক্ষমতা—অর্থাৎ কবির প্রধান দুটি গুণ—প্রচুররূপে বর্তমান। প্রকাশের কথায় আবার অনেক চিন্তা মনে উঠে। কোনো কোনো কবিতায় বাস্তবচিত্রগুলিকে জড়াইয়া চারিদিকে এমন একটা সংগীতের মেঘ জমিয়া উঠে যে, চিত্রগুলিকে ভালোমত দেখা যায় না, তাহার চারিদিক্ আবিষ্ট করিয়া একটা কুহেলিকার ঘোরের মতো থাকে—এটা অবশ্য আমাদের মনের বিভ্রমের ফল, আমাদের মনটাই সংগীতের দ্বারা এ স্থলে আবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই মেঘটা কাটিয়া ফেলিয়া শব্দগুলিকে বেশ লঘু, শুষ্ক রকমের করিয়া লইতে পারিলেই চিত্রগুলিকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া ফলানো যায়। স্বপ্ন-প্রয়াণে এইরূপ ভাষাই দেখিতে পাই—অথচ সর্বত্রই একটি মৃদুল, ললিত রকমের ধ্বনি খেলা করিয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাউক, ঠিক এইরূপ শব্দ এবং খুব ভাবপ্রকাশক্ষম শব্দ কোন্‌গুলা। সহজেই বুঝা যাইতে পারে—সে আমাদের ঘরের ভাষা, সে আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তার জীবন্ত idiomatic বা যোগরূঢ় ভাষা। স্বপ্ন-প্রয়াণের কবির যেমন বাংলার এই যোগরূঢ় ভাষার উপর হাত আছে, এইরূপ আর আমাদের কোনো কবিরই নাই। এই কাব্যে, আমাদের জীবন্ত সক্রিয় ঘাতশীল প্রতিদিনের গদ্য হইতে শব্দ বাছিয়া আনিয়া সেই ভাষার মধ্যেই নানা রসের জোয়ার ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিচিত্র সংস্কৃত শব্দগুলিকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা বিচিত্র মিলের তটে বাঁধিয়া, নানারূপ ছন্দের খাতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু যে এত কথা কহিতে পারে, আমাদের গৃহদ্বারের স্রোতটি যে গিরিশিখর পর্যন্ত উঠিতে পারে, পাতাল পর্যন্ত ডুব মারিতে পারে, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্ন-প্রয়াণের এইরূপ দেশী ভাষা বলিয়াই, ইহার চিত্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের উপর নাচিয়া উঠে, ভাবগুলি নেশায় ধরার মতো এত চট্ করিয়া আমাদের মনটিকে ধরিয়া ফেলে। স্বপ্ন-প্রয়াণ নিতান্তই দেশী। এই কাব্যখানির এত ঔজ্জ্বল্যের অন্যতম কারণ এই দেশীত্ব। কেবল ভাষাই নহে, ইহার ভাবসংগতিও নিতান্তরূপে দেশী। আনন্দরাজার সভা, হরষ-উল্লাস দুটি বালকের ব্যবহার; নন্দনপুরের বন-নদী-কান্তারের দৃশ্য; চিত্রলেখার হস্তে সরস্বতী, যশোদা, সীতা প্রভৃতির চিত্র; নৌকায় চড়িয়া প্রমোদপুরে গমন; প্রমোদপুরের চটুল, বিলাসী অধিবাসিগণ ও সভার রঙ্গময় নৃত্যগীত—বিষাদপুরের তালবেতাল, পেতিনী মাসী, বীভৎস অরণ্য—বিষাদপুরের বিড়ালের খঞ্জনী বাজানো, কাকাতুয়ার 'টুকুটাকু আহারে' 'কালো যেন লোহা' রসনা নড়ানো, হাড়গিলার থলিয়া ঝুলানো—বিষাদপুরের হাঁহাঁ-হুহু গন্ধর্ব, জাড্য মন্ত্রী, অন্ধকার-সভা; রসাতলের গভীর অন্ধকারে ভৈরব কাপালিক, কালীপুজা, শ্মশান, উল্কামুখী, বড়াইবুড়ি প্রভৃতি—সমর-প্রয়াণে যুদ্ধের বর্ণনা, মৈত্রদেবের 'বন্ধনপাশ'

ত্যাগ করা; দুর্ভিক্ষের অগ্নিবাণ-বৃষ্টি, বাণে বাণে কাটাকাটি; এবং অবশেষে শান্তি-প্রয়াণের তপোগিরি, শ্রেয়, শ্রেয়ঃপথ, স্বর্ণবেত্রহস্তে সুসঙ্গ; গিরিশিরে দাঁড়াইয়া ঋষিদলের স্তবগান—সর্বত্রই আমাদের স্বদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেশী বিচিত্র রূপকথা ও কাহিনী, আমাদের পরিচিত তান্ত্রিক-সাধনার ভীষণতা, দেশী ছবি, দেশী রামায়ণ-পুরাণের যুদ্ধবর্ণনা এবং আমাদের স্বদেশী ধর্মশাস্ত্রের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বটিও আমাদের স্বদেশী।

এই-ই স্বপ্ন-প্রয়াণের শক্তির অন্যতম মূলকারণ। স্বপ্ন-প্রয়াণের এই দৃঢ়, জ্বলন্ত, স্বদেশী ভাবটির কাছে বাংলার অন্যান্য কাব্য নিস্তেজ—কারণ, একে তো বিদেশী ভাবের অনুকরণ কিছুতেই দেশী ভাবের মতো স্ফূর্তি পাইতে পারে না—তার পরে আবার স্বপ্ন-প্রয়াণের মতো বাস্তবানুভূতি, ভাষায় এমন সম্পূর্ণ অধিকার কোনো কাব্যেই দেখা যায় না। তবেই দেখিতে পাই, স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি নিতান্ত দৃঢ়। এই দৃঢ়ত্বের যাহা অন্যতম প্রধান কারণ, এখন তাহাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাউক।

অনেকেই কোনো একটা বিষয়ে কাব্য লিখিতে হইবে, অন্যকে নিজের শক্তি দেখাইতে হইবে—এইজন্য কাব্য লিখিবার একটা বিষয় অনুসন্ধান করিতে নামিয়া পড়েন। ইহার ফল এই হয় যে, যাঁহারা ভাগ্যক্রমে নিজের শক্তির উপযোগী বিষয় পাইয়া যান, তাঁহাদের যা-হোক-কিছু-একটা দাঁড়ায়; কিন্তু যাঁহারা তাহা না পান, তাঁহারা এদিক্-ওদিক্ করিয়া একটা মূঢ় বিশৃঙ্খলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই কবি কোথায়, যিনি নিজের একটি আনন্দে সর্বাগ্রে বিভোর হইয়া, ভরপুর হইয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন? এইরূপ কবিগণ যখন কবিতা লিখিতে থাকেন, তখন ইঁহাদের কোনো লোকের কথা মনে থাকে না, যশ মনে থাকে না,—মনে, সকলের ঊর্ধ্বে জাগিয়া থাকে—আনন্দের জ্যোতির্ময় গিরিচূড়া এবং তাহারি পাদমূলে তাহারি স্তবগীতচ্ছন্দে মনের সমস্ত শক্তি হিল্লোলিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকে। এইরূপ কাব্যের পাঠকেরা একটি সুন্দর, আপনাতে-আপনি-বিলসিত আনন্দের আভাস পাইয়া ধন্য মানিয়া যায়। আমরা স্বপ্ন-প্রয়াণে এইরূপ আনন্দের আভাস পাইয়াছি। যে অধ্যাত্মজীবনের বিবৃতি স্বপ্ন-প্রয়াণে দেখা যায়—তাহা কবি কাব্য লিখিবার মানস করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন নাই—আগে হইতেই তাহার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। পরিচয় কোথায়? পরিচয় এই কাব্যের উদার স্ফূর্তিতে, পরিচয় ইহার যথাযথ পরিমাণে। কিন্তু পরিষ্কার-বলিয়া-দেওয়া পরিচয়ও আছে—কাব্যের আরম্ভেই আছে, যেমন সংস্কৃতকাব্যে থাকিত—তাহার কতক অংশ এই প্রবন্ধেরই আরম্ভ-ভাগে উদ্ধৃতও করিয়াছি; অপর অংশ এই—

কবি কল্পনাকে বলিতেছেন—

রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য' শুনি।
তোমাসঙ্গে তথায় না যা'ব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি!
অই মম তপ, অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।

এই আবেগপূর্ণ উক্তিতেই সেই আনন্দের পরিচয়।

আমি যতদূর বুঝি, ততদূর স্বপ্ন-প্রয়াণের মূল সৌন্দর্যগুলি বিবৃত করিলাম। এখন একটি প্রশ্ন করিবার সময় উপস্থিত। এত সুন্দর, এত অলকার মায়াময়, এত অদ্ভুত পৌরুষ-বিশিষ্ট কাব্যখানি—তবু ইহার আদর কেন হয় নাই? কাব্যামোদী অল্পসংখ্যক লোকের

কাছে আদর হইলেও স্বপ্ন-প্রয়াণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা স্থির। কেন? ইহার কারণ কি? কারণ সেই গ্রে এবং পোপ্। কারণ সহজ ভাষা ও গভীর সৌন্দর্যের অমূল্য মাহাত্ম্য অনেকেরই তখন অধিগম্য ছিল না। কিন্তু আরও কারণ থাকিতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, স্বপ্ন-প্রয়াণ রূপক। রূপক ব্যক্তিত্বের সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না, সে মনোরাজ্যের সুদূর গুহায় ভিত্তি পাতিত করে। ভাবিয়াও দেখি, স্বপ্ন-প্রয়াণে ব্যক্তিত্বের সংঘাতোত্থ ঘূর্ণা নাই—ইহার স্বপ্নদৃষ্ট দল, একের পর আরেকটি, স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—এইগুলির উপর মানুষের কতকটা আকারপ্রকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র—হৃদয়ের গভীর করুণা, শোক, সন্দেহ প্রভৃতির বিচিত্র কুটিল আবর্ত ইহার মধ্যে দেখা যায় না—এ কাব্যে ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল নাই। এইরূপ একটা কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু তথাপি যদি কবিত্ব আদৃত হইত, তবে এ দোষটা গণনা না করা যাইতেও পারিত। যে ভাবে আছে, ইহাকে সেই ভাবেই কেন গ্রহণ করা যাউক না? ইহা স্বপ্ন-প্রয়াণ নাম ধরিয়া, ইহার সুন্দর বিকটগম্ভীর অত্যুজ্জ্বল স্বপ্নরাজ্য সৃজনের দ্বারা নিজের নাম সার্থক করিয়াছে—আমরা সেই ভাবেই কেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না করি? সেই ভাবে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমরা স্বপ্ন-প্রয়াণে আমাদের চিত্তকে বহু বহু দূরে—বহু রত্নদ্বীপের উপকূলে, বহু গুহার শ্রবণপ্রবণ অন্ধকারে সাঁতার দেওয়াইয়া, একটি অদ্ভুত শক্তির আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিব—নিরঞ্জন নেত্রে সহসা জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া দেখা দিবে, নির্মুক্ত শ্রবণকুহরে আনন্দের বিশ্বব্যাপী বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। তবুও কিন্তু অনেকেই আদর করিল না—তাহার কারণ আছে, যথা—পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেখাইলেও, স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিবার শক্তি সকলেই রাখে না। অনেক লোকই কর্মিষ্ঠ সংসারী ব্যক্তি—কাজকর্মের অবসানে দিব্য নিদ্রা দিয়া আরাম লাভ করে। সেই নিদ্রার মধ্যে বিকৃত স্বপ্ন অনিবার্যরূপে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু জাগিয়াও এতটা নিষ্ফল স্বপ্ন লইয়া বসিয়া থাকিবার শক্তি অনেকেরই নাই। অথচ যদি রীত্যনুসারে সংস্কৃত-শব্দের হাতিতে চড়াইয়া, অতি বিকৃত সাজসজ্জাতেও, কতগুলা ক্ষণিক বাহ্যিক রূঢ়-দেবতাকে বাহির করিতে পার—তবে ইহারা দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে বাহবা দিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বপ্নামোদিগণ এই দলের জন্য কৃপা রাখিয়া অচিরেই আবার সেই বিচিত্র স্বর্গ-রসাতল-অভিমুখে পলায়ন করিয়া থাকেন।

১৩০৯

স্বপ্ন-প্রয়াণ নূতন কাব্য নয়—নিত্য-নূতন, যাহা কখনও পুরাতন হয় না। "A thing of beauty is a joy for ever!" ইহার ১ম সর্গ ১২৮০ সালে ২য় বৎসরের বঙ্গদর্শনে রচয়িতার নাম বিনা বাহির হয়। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই, বোধ হয়, এই অভিনব কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং সর্বাঙ্গীণ মৌলিকতা দেখিয়া নূতন কবির পরিচয় পাইবার জন্য আমার মতো উৎসুক হইয়াছিল। পরে ১৭৯৭ শকে—অর্থাৎ আজ ৪০ বৎসর হইল সম্পূর্ণ কাব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইখানে পাঠকের বিরক্তিকর এবং ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইলেও, সমালোচনার মুখবন্ধ-স্বরূপ ঐ নব-প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে আমার নিজের একটি স্মৃতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যখনই স্বপ্ন-প্রয়াণের কথা উঠে, তখনই অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে একখানি পুস্তক নিতান্ত অসম্ভাবিত স্থানে আমার বিস্মিত লোলুপ নয়নকে আকৃষ্ট করে। মানস-সরোবরের তীরে নয়—বটতলার একটি সংকীর্ণগৃহ দোকানে। অসম্ভাবিত কেনই বা বলি? সেদিনকার সময়ে কলিকাতার সারস্বত মন্দির বটতলায়ই ছিল। বাংলা সাহিত্যের অক্ষয়কীর্তি গোত্রপতিগণের সাক্ষাৎ তখন এই বটবৃক্ষের ছায়া-তলেই লাভ করা যাইত। গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়—সুলভ মূল্যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে ভক্তিপ্রণোদিতচিত্তে এই যুগের বেদব্যাসের আসনে বসাইয়াছেন। বটতলার একজন খ্যাতনামা প্রধান পুস্তক-প্রকাশক এবং বিক্রেতা 'নৃত্যলাল শীল বঙ্গসাহিত্যে বেদব্যাসানুরূপ যশের পাত্র না হউন, তাঁহার কিঞ্চিৎ নিম্নের আসন পাইতে পারেন। তাঁহার কল্যাণে আমরা কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবকবিগণ প্রভৃতির পুস্তকসকল সেকালে দেখিতে পাইতাম। সেই সকল বঙ্গীয় সাহিত্যগুরুদের অমূল্য-গ্রন্থসমূহ, দেশী বিবর্ণ কাগজে ভাঙা অক্ষরে—অনির্দেশ্য চিত্র-সম্পদে রঞ্জিত তৎকর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে (স্পষ্টবাদী দুষ্টলোকে বলিবেন, ভ্রম-সংকুল সংস্করণে) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বটতলা বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান এবং পরলোক-গত নৃত্যলাল শীল মহোদয় সেখানকার মন্দিরের একজন প্রধান পূজারী। উভয়ই বঙ্গীয় পাঠকের নমস্য। সে যাহা হউক, পুস্তকখানির সন্ধান পাইয়া তন্মুহূর্তে তাহা আত্মসাৎ করি এবং বাড়ি ফিরিয়াই অতিশয় উৎসাহের সহিত পড়িতে বসি। এতদিন পরেও সেদিনকার সে উৎসাহ—সে আনন্দ তদানীন্তন গভীর রেখায় এবং উজ্জ্বল বর্ণে আজিও চিত্রের ন্যায় স্মৃতিপটে অঙ্কিত। মনে পড়ে, মানসিক উপভোগে এত মগ্ন ও মত্ত হইয়াছিলাম যে, স্নানাহারের সময় অতীত হইলেও—দ্বিপ্রহরের পরেও—এক স্রোতে পুস্তকের অর্ধাংশ না পড়িয়া ছাড়িতে পারি নাই—বা পুস্তক আমাকে ছাড়ে নাই। আহারের সময় উপস্থিত হইলে দময়ন্তী তাঁহার বার্তা নলরাজের নিকট উত্থাপিত করিতে হংসদূতকে নিষেধ করিয়াছিলেন—জঠরাগ্নির নিকট প্রেমের আগুনকেও খাটো হইতে হয়— কিন্তু কাব্যামোদীর "পিত্তেন দূনে" এ আশঙ্কা নাই।

আজ ৪০ বৎসর পরে স্বপ্ন-প্রয়াণের নবতম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমিও এই শুভ সুযোগে কাব্যের সমালোচনা করিবার চিরপোষিত আশা এবং ইচ্ছা সম্পাদন করিব। তবে যদি একাধিকবার পাঠ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগে কোনো পাঠককে কাব্যের মর্ম এবং গুণগ্রহণে সক্ষম করে তবে সে দাবি আমি করিতে পারি—এবং জানি না কাব্যপাঠজনিত আনন্দ ও সে আনন্দে অপরকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা কাব্য-সমালোচনার আর

কোনো বলবত্তর প্রণোদনা আছে কিনা।

স্বপ্ন-প্রয়াণ একখানি রূপক। ইহার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় লিখিত জগতের দুইখানি উৎকৃষ্ট বা সর্বোৎকৃষ্ট রূপকের সৌসাদৃশ্য আছে। একখানি কবি Spenser কর্তৃক পদ্যে লিখিত *Faerie Queene*—দ্বিতীয়খানি Bunyan কর্তৃক গদ্যে লিখিত জগৎ-বিখ্যাত *Pilgrim's Progress*। তিনখানিই সমশ্রেণীর—এবং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য এক না হইলেও পরস্পরের নিকটবর্তী। তাহাদের অন্তর্গত ভাব একই। আধ্যাত্মিক বাঞ্ছিত লাভের জন্য তিনখানি কাব্যেরই নায়কের চেষ্টা এবং উদ্যম। তাহার দরুন তাহাদের যে মানসিক সংগ্রাম তাহা স্থূল সংগ্রাম রূপে বর্ণিত এবং তাহাই কাব্যের আখ্যানবস্তু। হৃদয়ের প্রবৃত্তিসকলও, গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে ব্যক্তিগতভাবে রঙ্গমঞ্চে আনীত। কুপ্রবৃত্তি বা প্রতিকূল প্রভাবসকল শত্রুরূপে এবং সুপ্রবৃত্তি বা অনুকূল প্রভাব ও অবস্থাসকল মিত্ররূপে বর্ণিত। বলা আবশ্যক যে তিনখানি রূপকের মধ্যে *Faerie Queene* অসম্পূর্ণ—ইহা ১২ পর্বে সম্পূর্ণ করিবার কল্পনা হইয়াছিল এবং কাহারও মতে ১২ পর্বই রচিতও হইয়াছিল—শেষ ছয় পর্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পর্বে এক-একটি নৈতিকগুণ—(যেমন Holiness=পবিত্রতা, Temperance=মিতাচার, Friendship =মৈত্রী প্রভৃতি) যোদ্ধারূপে চিত্রিত এবং তাহাদের কার্যকলাপে তাহাদের নামানুরূপ ধর্ম পরিস্ফুট! ১ম পর্ব আপনাতেই সম্পূর্ণ—গল্প উপভোগের জন্য কাব্যের অপরাপর অংশ পাঠের আবশ্যক নাই। সুতরাং ১ম পর্বকে একটি সম্পূর্ণ রূপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়—ইহার Knight of the Red Cross— পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক—নায়িকা (Una) সত্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে (Duessa) মিথ্যা, (Archimago) কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ আপদে পড়িয়া ভ্রান্তির অরণ্যে (Wood of errors) পথ হারাইয়া নিরাশার গহ্বরে (Cave of despair) পতিত হইয়া পরে অভিলষিত লাভ করেন।

Bunyan-এর রূপকের (*Pilgrim's Progress*) নায়কও Christian মুক্তিলাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বাস (Faithful), আশ্বাস (Hopeful), জ্ঞান (Knowledge), সতর্কতা (Watchful) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যধামে (Celestial City) প্রবেশ করে। পাঠক দেখিবেন, তাঁহার পূর্ববর্তী *Faerie Queene*-এর ভাবের সঙ্গে যেমন *Pilgrim's Progress*-এর আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে—সেইরূপ, অন্যদিকে নায়কের অভিযান এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাসকল স্বপ্নাবেশে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত হওয়ার দরুন, তাহার পরবর্তী রূপক আমাদের সমালোচ্য স্বপ্ন-প্রয়াণের সহিত, তাহার বাহ্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রবাবু এই দুই রূপক হইতে, জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। করুন বা না করুন—তাঁহার কাব্য আগাগোড়া এমন অসাধারণ মৌলিক ভাবসংগঠিত এবং সৌন্দর্যসম্পদে মণ্ডিত যে, ঐ সামান্য বাহ্য সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যই নয়।

Spenser-এর *Faerie Queene* এবং Bunyan-এর *Pilgrim's Progress*-এর নায়কের ন্যায় স্বপ্ন-প্রয়াণেরও নায়ক (একজন কবি বা কবি-প্রকৃতি লোক) তাহার নায়িকা কল্পনাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত। *Faerie Queene*-এ যেমন Duessa নায়িকা Una-কে নায়কের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল স্বপ্ন-প্রয়াণে তেমনই লালসাও ফাঁদ পাতিয়াছিল এবং নায়ক অশেষবিধ বিঘ্ন-বিপদে পড়িয়া সর্বশেষে দাক্ষ্য, বীর-রস, সখ্য-রস প্রভৃতির সাহায্যে "কল্পনা"কে আয়ত্ত করিয়া শান্তি-নিকেতনে তাহার সহিত মিলিত হইয়া একজীবন হইয়াছিল—ইহাই স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের সহজ আখ্যানবস্তু।

আমার মতে এবং যতদূর জানি, সাধারণ পাঠকের মতে—স্বপ্ন-প্রয়াণ রূপক। গ্রন্থকারও ১ম সংস্করণে উহাকে রূপক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন—পরবর্তী সংস্করণে তাহা করেন নাই। তাহাতে কিন্তু ইহার রূপকত্ব ঘুচিবে না। তবে যখন রূপকের পাত্র-পাত্রী অশরীরী মনোভাব এবং হৃদয়বৃত্তি হইলেও তাহাদের ভিতর গল্পের সাধারণ পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ভাব ও প্রকৃতি বেশ পরিস্ফুট—অর্থাৎ যখন সেই-সকল সূক্ষ্ম ভাব ও হৃদয়বৃত্তি প্রকৃত মানুষের ন্যায় কার্য করে— তখন তাহার রূপকত্ব চলিয়া যায়। যেমন স্বপ্ন-প্রয়াণে সখ্য-রস বাস্তবজীবনের একজন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কথাবার্তা কহিয়াছে এবং কার্য ও ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সখ্য-রস নামে আখ্যাত না করিয়া · · · বলিতে পার—এবং লালসা না বলিয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কাঞ্চন নামে ডাকিতে পার।

রূপক হিসাবে *Pilgrim's Progress* এবং স্বপ্ন-প্রয়াণ *Faerie Queene* অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমোক্ত দুইখানি রূপকের আখ্যান-বস্তু সহজ এবং সুনির্দিষ্ট; গল্পটি বেশ যথাযথ বলা হইয়াছে। "তারপর কি হইল?" জানিতে পাঠকের ঔৎসুক্য জন্মায়—কিন্তু *Faerie Queene* -এর রূপক সর্বথা সহজ ও পরিষ্কার নয়। তাহা একাধিক সূত্রে গ্রথিত ও জটিল এবং তাহার ভিতর একাধিক উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনও নৈতিক—আবার কখনও ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জড়িত। কবির সমসাময়িকদিগের প্রতি কোথাও বা স্পষ্ট লক্ষ্য—কোথাও বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তাহাও সব সময়ে পূর্বাপর এক ব্যক্তিরই প্রতি নয়। যদিও Gloriana আর কেহ নয়— সম্রাজ্ঞী Elizabeth —কিন্তু King Arthur কখনও Earl of Leicester, কখনও Sir Philip Sydney, কখনও বা অপর কেহ।

গল্পের হিসাবে তিনখানি রূপকের মধ্যে লোকরঞ্জনে *Pilgrim's Progress*-এর প্রাধান্য—এবং গদ্যে লিখিত বলিয়া আবালবৃদ্ধ সকলেরই সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। যদিও পদ্যে লিখিত নয়, Bunyan গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন এবং Lord Macaulay-র উচ্চ প্রশংসা সর্বতোভাবে যোগ্য।

আর এক হিসাবেও *Pilgrim's Progress*-এর অপর দুইখানি রূপকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। *Pilgrim's Progress*-এ মানবজীবনের সমস্ত পরিসর ব্যাপিয়া আছে। অসম্পূর্ণ *Faerie Queene* -এর বাকি অংশ রচিত হইলে বা থাকিলে তাহাতে জীবনের আরও বিস্তৃত চিত্র দেখা যাইত; কিন্তু যে পদ্ধতিতে *Faerie Queene* রচিত তাহাতে একখানি সমগ্র পটে বা এক দৃষ্টিতে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র দর্শিত হইত না—পৃথক পৃথক আখ্যানের দ্বারা—ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে তাহা খণ্ডশঃ প্রকাশ পাইয়া সমগ্রের বিশালতায় পাঠককে অভিভূত করিত না। যেমন নানা উপাখ্যানে গ্রথিত Victor Hugo-র La legenda des siecles-এ আমরা রামায়ণ বা Iliad-এর, *Divina Comedia* বা *Paradise Lost* -এর অখণ্ড বিশালতা অনুভব করি না। স্বপ্ন-প্রয়াণের পরিসর *Pilgrim's Progress* হইতে সংকীর্ণ—ইহাতে কেবল কলাবিদ্যার ক্ষেত্রই মুখ্যতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বা কাব্যরসগ্রাহী ব্যক্তিকে ইহা যেমন স্পর্শ করিবে, অপরকে তেমন করিবে না—কিন্তু পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন। কল্পনাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে নায়ক-কবির হৃদয় নির্মল এবং পবিত্র করিতে হইয়াছে এবং প্রতিকূল প্রবৃত্তি ও অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার বর্ণনায় শ্রেয়ঃ পথের যে সকল অনিবার্য বিঘ্ন ও বাধা, তাহা আনুপূর্বিক যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। পথের একটিও দিক ছাড়া হয় নাই—যেমন করিয়া পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—কোথাও 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'—কোথাও দুরারোহ পর্বত—কোথাও অতল গহ্বর—কোথাও জীবনশূন্য আতপদগ্ধ বালুময় মরু—কোথাও শান্তিরসে সিঞ্চিত

ছায়াবহুল কান্তার—সকলই মানচিত্রের ন্যায় কাব্যে সুস্পষ্ট দর্শিত হইয়াছে। এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ-বৈজ্ঞানিকের মতো মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলাচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এক অসাধারণ গুণ—ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণীগত সংকীর্ণতা নাই। বাস্তব জীবনের উপর—উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত। জীবনে যেমন ঘটে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—এবং সকলের উপর উজ্জ্বল কল্পনার উন্মাদিনী জ্যোৎস্না বর্ষিত। সেই কল্পনা তুলনারহিত ভাষায় অপ্সরা-চরণের নূপুরনিক্কণবৎ শ্রুতিমধুর ছন্দে এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবিধবর্ণে বিচিত্র শব্দ-যোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক কল্পনার ঔজ্জ্বল্য এবং ছটায়—শব্দ ও ছন্দের মধুর ঝংকারে স্বপ্ন-প্রয়াণ—বাংলা সাহিত্যে একা—ইহার দ্বিতীয় নাই। বাংলা সাহিত্যে শুধু কেন, ভাষা ও ছন্দ-সম্পদে, জগতের সাহিত্যে ইহার আসন—সিংহাসন! অনেকে ইহাকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারেন—কিন্তু যে কেহ কাব্যখানি পাঠ করিয়াছেন তিনিই আমার মন্তব্যকে কবির যথাপ্রাপ্য প্রশংসা বিবেচনা করিবেন। মুক্তকণ্ঠে এই যথাপ্রাপ্য প্রশংসা না করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।

সমালোচনার মুখবন্ধে আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি—এখন পাঠককে সঙ্গে লইয়া কাব্যের প্রতি-সর্গে বিচরণ করিব—এবং যতদূর পারি অসংখ্য সৌন্দর্যের মধ্যে কতক চয়ন করিয়া আমার উপরোক্ত উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ দলিল দাখিল করিব।

কাব্যের ১ম সর্গে নায়কের মনোরাজ্যে অভিযান। ইহা আগাগোড়া কল্পনায়—কথায়—ছন্দে পাঠককে অভিভূত করে—ইহার ছন্দ কবির নিজের মৌলিক সৃষ্টি—এ বিষয়েও Spenser-এর *Faerie Queene*-এর সঙ্গে ইহার সমান সৌভাগ্য—Spenserian Stanza, Spenser দ্বারাই গঠিত—কিন্তু তাহার অনেকটা উপাদান Spenser ইতালীয় কবি Ariosto এবং Tasso হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পরবর্তী অনেক কবি, যেমন Thompson, Byron, Shelley প্রভৃতি, ঐ ছন্দে লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ছন্দ পূর্বেকার কোনো কবি গড়ে নাই এবং পরবর্তী কোনো কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুসরণ করিতে সাহস করে নাই। এমন-কি বাংলায় যিনি অসংখ্য বিভিন্ন নব নব সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়াছেন—যিনি অসাধারণ নিপুণতার সহিত বাংলা শব্দে নূতন নূতন স্বর যোজনায়, ছন্দে নূতন নূতন ধ্বনি এবং ঝংকার আবিষ্কার করিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। কিন্তু ছন্দ নূতন হইলেও উৎকট কিছুই কানে ঠেকে না—স্রোতঃপুষ্ট প্রফুল্ল প্রবাহিনীর ন্যায় মধুর কল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে "স্বপ্ন রমণী" বর্ণিত কিন্তু তৎপূর্বে ১ম দুই পঙ্‌ক্তিতে কবিতার সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হইয়া চিত্তকে আপ্লুত করে।

> সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ—
> সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন!

সৌন্দর্যে ইহা উপমা-প্রয়োগের রাজচক্রবর্তী কালিদাসের উপমার তুল্য। পর পর দুই শ্লোকে সুপ্তির আনুষঙ্গিক উপাদান সকল এমন সুন্দর সরঞ্জামে সাজানো হইয়াছে যে পাঠকালে ঘুমের আবেশ আসিয়া পড়ে। Rossetti-র

> **Master of the murmuring Court**
> **When the shapes of sleep Convene.**

চক্ষের সম্মুখে উদয় হয়।

তৎপরে কল্পনা-চালিত মনোরথ উপস্থিত এবং স্বপনের আদেশে কবি তাহাতে আরোহণ করিলেন। Shelley-রচিত *Queen Mab* নামক কাব্যে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

১৯১৫

[অসম্পূর্ণ। ১৬৬ পৃষ্ঠার...চিহ্নিত অংশের পাণ্ডুলিপি জীর্ণ।

স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি একটি দ্বীপের মতো।

মানবচিত্তসিন্ধু যুগযুগান্তর প্লাবিত করিয়া উচ্ছল তরল কলরবে ওঠে পড়ে; নীলাকাশে নীল তরঙ্গমালার ফেনপুঞ্জিত বিচিত্র ভঙ্গী উদ্যত করিয়া কত কী ব্যক্ত করিতে চায়, পারে না; কারণ কিছুই স্থির থাকে না, কিছুই রূপ ধরিয়া ওঠে না—প্রাক্‌সৃষ্টির সীমাহীন এই ব্যাকুলতার অন্তর হইতে সাহিত্য বা রসসৃষ্টি ধীরে ধীরে অজ্ঞাত অপরিচিত ভূভাগের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে নিজেই নিজেকে পরিচিত করিয়াছে। যুগযুগান্তর-ব্যাপিনী চেতনা, আর তাহারই অন্তহীন কূলে উপকূলে যুগযুগান্তরব্যাপী সাহিত্য। এক-এক জাতির সৃষ্ট সাহিত্যকে এক-একটি নূতন মহাদেশ ধরা যাইতে পারে এবং এ হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র মানসভূভাগ মানব-অধ্যুষিত সমগ্র বাস্তব ভূভাগের তুলনায় বহুগুণে বৃহত্তর ও বিচিত্রতর—ইহারই অগ্রসরশীল দিগন্তের পর দিগন্তের আহ্বানে বিস্মিত ব্যক্তিমনের তীর্থপর্যটনের কোনো দিকেই কোনো শেষ নাই।

বাঙালির মানসভূভাগের হিমাবৃত উত্তরমেরু কোথায় কোন্ শূন্যপুরাণে বা বৌদ্ধ দোঁহায়, পণ্ডিতগণের নিকটে তাহার দিশা মিলিবে; বৈষ্ণবপদাবলীতে মঙ্গলকাব্যে পাঁচালিতে গীতিকায় বাউলগানে বিচিত্র যে পুরাতন অববাহিকাভূমি, বাঙালির জীবনে তাহার পুঞ্জীভূত দান এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই; আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল অভিঘাতে বিপুল এক ভূমিকম্পের পীড়নে শস্যশ্যামল ধীরসমীরসঞ্চরিত সেই সমতলপ্রদেশ বিদীর্ণ ও বিত্রস্ত হইয়া যে অভিনব নদীনদ-পর্বতগহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই আমরা বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-ভূদেব-দীনবন্ধু-অধিষ্ঠিত আধুনিক বাংলাসাহিত্য বলি: তারপর সন্ধ্যাসংগীতের শুরু হইতে শেষলেখার সময় পর্যন্ত, এক যুগসন্ধির প্রাগুষা হইতে আর-এক যুগসন্ধির আরক্ত দিবাবসানের মধ্যেই, যে আশ্চর্য বিশাল ঐশ্বর্যময় ধরিত্রী বেদে ও পুরাণে বর্ণিত উর্বশীর মতোই সমুদ্রসম্ভবা এবং উর্বশীর মতোই চিরতরুণী—আজ হইতে এক শত বৎসর পরে রবীন্দ্রবর্ষ বলিয়া যাহার খ্যাতি দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পথিক প্রাণকে উৎসুক করিয়া তুলিবে, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় না জানিলেও, বিস্ময়ের শেষ না হইলেও, সেই ভূমিতেই আজিকার বাঙালি আমরা বাস করিতেছি। কিন্তু, আধুনিক বাঙালির বাসভূমিরই সামিল, অথচ তাহা হইতে সমুদ্রের এক উৎক্ষিপ্ত সংকীর্ণ বাহুর বেষ্টনে বিচ্ছিন্ন, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে—তাহারই নাম স্বপ্ন-প্রয়াণ।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে রচিত এই কাব্যখানি বাঙালি পাঠকের বিশেষ পরিচিত নহে। ইহার স্ফুরদ্‌বিদ্যুৎ নীলাভ জলদমালায় আলিঙ্গিত গিরিশিখর ও দূরত্বহেতু-নীলবর্ণ তালতমালসর্জের বনশ্রেণী সমুদ্রের নীলদর্পণে ও আকাশের নীলপটে এমনই মিলাইয়া গেছে যে সে কাহারও চোখে পড়ে না। সাধারণ মানুষের দিগন্ত হাতড়াইয়া বেড়ানো স্বভাবই নয়; কদাচিৎ ইহার অন্যথা হইলেও অন্য ভাষার ও অন্য যুগের অন্য-কোনো কবির রচনা আমাদের মনোহরণ করে, কিন্তু অতি নিকটের দেশে ও কালে বর্তমান স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানির কোনো সন্ধান পাই না। শরৎঋতুর কোনো এক সকাল-বেলায় এমন ইচ্ছা হয় না যে, উপস্থিতের-ঘাটে-বাঁধা নৌকাখানার রশি খুলিয়া দিয়া, বাতাসে শুভ্র পাল তুলিয়া দিয়া, অন্তত একবারও ভাসিয়া পড়ি। সুপ্তিমগ্ন সমুদ্রের এই উপকূলসীমাটুকু আদৌ তরঙ্গসঙ্কুল নয়, ঝটিকা নাই, এবং মগ্নগিরির দংষ্ট্রাঘাতে ভরাডুবি হইবার কোনোই আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অথচ, তরল কল্লোলাকুল অনতি-

প্রসর এই বাধাটুকু অতিক্রম করিলেই স্বপ্নপরিচিত অপরিচিত দ্বীপের স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত নিপুণচিত্রিত সৌন্দর্যসম্পদে মুগ্ধ দৃষ্টির আশাতীত পুরস্কার মিলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্বীপভূমি বলিয়া ইহার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রমণীয়তা আছে; এখানকার সমুদ্রশীকরবাহী সমীরণে চিরশরতের সুখস্পর্শ সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে; কুঞ্জে কুঞ্জে কত প্রসূনের হাসি, কত বিহঙ্গের গান—তাহাদের চিনি-চিনি মনে হয়, সম্পূর্ণ চিনিতে পারি না। আকাশের দুই দিগন্ত চুম্বন করিয়া বর্ণের একখানি ইন্দ্রধনু প্রসারিত; তাহার আভা কোথায় যে লাগে নাই তাহা বলিতে পারি না।

২

বাংলা ভাষায় স্বপ্ন-প্রয়াণই বোধ হয় স্মরণযোগ্য একমাত্র রূপককাব্য; তাই বর্তমান আলোচনার সূচনাতে রূপকতার ঈষৎ ছোঁয়া লাগিলেও দোষ নাই। কিন্তু, কাব্যের পক্ষে আগাগোড়া রূপক হওয়া সম্ভবপর, কাব্যের আলোচনায় সে প্রথা বেশি দূর চলিবে না; কাব্য হিসাবে স্বপ্ন-প্রয়াণের বিশিষ্টতা কী, উহাতে কোন্ বিশেষ রস কোন্ বিশেষ কৌশলে পরিবেশন করা হইয়াছে, অলংকারবিরল প্রাঞ্জল গদ্যে তাহা ভাবিয়া দেখা ও ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

ইংরেজি সাহিত্যে দুখানি রূপককাব্য বহুখ্যাত; তাহারই দূরাগত শ্রুতিস্মৃতি হইতে বর্তমান লেখকও বঞ্চিত নন। একখানি হইল বনিয়ান্-এর পিল্‌গ্রিমস্ প্রগ্রেস, আর-একখানি স্পেন্‌সর্-এর ফেয়ারী কুঈন। একখানি গদ্যে আর-একখানি ছন্দোবন্ধে লেখা। প্রথমোক্ত কাব্যের বিষয় হইল মুক্তিস্বর্গকামী মানবাত্মার নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া নানা প্রলোভন ও বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া, বিশ্বাস বিবেক ও নিষ্ঠার আনুকূল্যে ও ইষ্টের প্রসাদে, অন্তিম আকাঙ্ক্ষাতীর্থে উত্তীর্ণ হওয়া। দ্বিতীয় কাব্যখানি অর্থাৎ স্পেন্‌সর্-এর ফেয়ারী কুঈন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহার এক-একটি সর্গে সাত্ত্বিকতা, সংযম, মৈত্রী প্রভৃতি এক-একটি সদ্‌গুণের অভিযানকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম সর্গে 'পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক... সত্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে মিথ্যা, কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ্ আপদে পড়িয়া, ভ্রান্তির অরণ্যে পথ হারাইয়া, নিরাশার গহ্বরে পতিত হইয়া, পরে অভিলষিত লাভ করেন।'[১]

'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' সিন্ধবাদকল্প প্রিয়নাথ সেন বলেন, স্বপ্ন-প্রয়াণ ও 'মুক্তিপথযাত্রী' এই দুইখানি কাব্যই রূপক হিসাবে ফেয়ারী কুঈন-এর তুলনায় সার্থকতর রচনা। আখ্যানবস্তু সুব্যক্ত ও সুনির্দিষ্ট, পদে পদে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়া উঠে ও ঘটনাপরম্পরায় তাহার যথোচিত নিবৃত্তি ঘটে; স্পেন্‌সর্-এর কাব্যে প্রবেশ করিয়া যেমন হয় তেমন করিয়া জটিল কল্পনার জালে ও অবান্তর বিষয়ের অনুসরণে পথ হারাইতে হয় না।

নিছক গল্পের হিসাবে বনিয়ান-এর গদ্যকাব্য তুলনারহিত; তাহার কল্পনার ক্ষেত্রও অতিশয় বিস্তৃত, 'মানবজীবনের সমস্ত পরিসর ব্যাপিয়া আছে।' স্বপ্ন-প্রয়াণ সম্পর্কে রসিক পাঠকের অনুরূপ কোনো দাবি নাই। রচয়িতার উদ্দেশ্যও সেরূপ ছিল না। এ কাব্যের নায়ক যে কবি, মুমুক্ষু সাধক নয়; বর্ণনার বিষয় হইল—স্বপ্নের কুহকে

[১]প্রিয়নাথ সেন।

মনোরথযাত্রা ও নন্দনের আনন্দনিকেতনে কল্পনাবালার সহিত মিলন। অন্য কথায় বলিতে গেলে, স্বপ্ন-প্রয়াণ নিছক কাব্যগ্রন্থ; তন্ন তন্ন করিয়া মানবমানসের সৌন্দর্যচয় আবিষ্কার করা ও তাহারই নানা অবস্থায় মৈত্রী প্রীতি শান্তি সাহস প্রভৃতি মনোবৃত্তির আবির্ভাব-তিরোভাবে বিচিত্র রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি করা, ইহা ছাড়া তাহাতে কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ছিল না।

ছিল না বটে, তবুও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপনিষদের স্তন্যে লালিত হইয়া—বৈষ্ণব ও বাউলের গান কানে রাখিয়া—নিখিল সৃষ্টির মূলে একই বস্তু, দুই নয়, এই অজপা রক্তের কণায় কণায় জপিয়া—ইহ ও অমুত্র, সুখ ও কল্যাণ, সুন্দর ও সৎ, একটি হইতে আর-একটির একান্ত ভেদ কল্পনা করা বা সীমান্ত নির্দেশ করা হিন্দু কবির কল্পনাতেও অসম্ভব ছিল। তাই কবির সচেতন প্রয়াস ও আপাতপ্রতীয়মান উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি হইলেও উহার প্রত্যেক কল্পনাভঙ্গীতেই তদতিরিক্ত ভূমার প্রতি ইঙ্গিত দেখা যায় এবং ঐ অদ্বৈতেরই উচ্চারিত উচ্ছ্বসিত বন্দনাগানে গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

ইংরেজি দুইখানি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি, এদেশীয় একখানি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ করিয়া তুলনা দেওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই নাটকটি হইল শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়। স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের সহিত রুচিতে প্রকৃতিতে প্রকাশশক্তিতে মিল নাই, কিন্তু জাতিগত যে মিল আছে তাহাই প্রণিধানের বিষয়।

উক্ত দৃশ্যকাব্যের আখ্যায়িকাসূত্র হইল এই যে, আদিপুরুষের সংকল্প হইতে মায়া মন-নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই মন হইতে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ কাম ক্রোধ আদি এবং নিবৃত্তির গর্ভে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সন্তান জন্মিল। প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের চক্রান্তে আত্মা আত্মবিস্মৃত ও বন্দীকৃত। নিবৃত্তিপক্ষীয়গণের চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইল তাঁহাকে মুক্ত করা। ফলে, বিবেকের ঔরসে উপনিষদের গর্ভে বিদ্যানাম্নী কুলগ্রাসিনী কন্যার জন্ম ও তাহারই অনুজ প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ ও স্বমহিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

এই নাটকখানি যে পুরাদস্তুর একখানি রূপক, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং ইহার তত্ত্বাংশও, খুব সম্ভব, যুক্তিতর্কসিদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ও 'অখণ্ডনীয়'। কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। ইহাকে সার্থক দৃশ্যকাব্য বলা যায় না। ইহাতে ঘটনা নাই বলিলেই হয়; ঘটনার বর্ণনাও বিরল, কারণ শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া বর্ণ ও রেখাপাতের বিভূতি সুলভ নয়; ঘটনার ব্যাখ্যাতেই আগাগোড়া ছয়টি অঙ্ক ভরাট হইয়া আছে। অধিকন্তু, রাঢ়দেশের ভূতচক্রগ্রাম, বারাণসীধাম, আদিকেশবের মন্দির, এ-সব আছে; তুরস্কের মানুষ, কুমারিল ভট্ট, 'নাস্তিক, তস্কর ও বৌদ্ধভিক্ষু'গণ, তাহাও আছে; গীতা এবং সাংখ্যপাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের শরীরী অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ অস্তিত্বের ও ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে—মোট কথা, তত্ত্ব আর কল্পনা, বাস্তব আর অবাস্তব মিলাইয়া বেশ একটি গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে, তত্ত্ব হিসাবে ইহা যত উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থই হউক, কল্পনা হিসাবে স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের নিকটে শুষ্ক ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়। বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, কবি ছিলেন না। অন্যদিকে, স্বপ্নপ্রয়াণী দ্বিজেন্দ্রনাথ পণ্ডিত হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় কবিপ্রতিভাও স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ। অন্তর্লীন চিন্তাশক্তি ও ধীশক্তিকে ফুলে-পল্লবে ছায়ায়-আলোয় ও বর্ণগন্ধের বিচিত্র হিল্লোলে আবৃত করিয়া, স্বতউচ্ছ্বসিত অথচ সংযমিত রসশ্রী বিরাজ করিতেছে।

৩

স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্য সাতটি সর্গে সম্পূর্ণ। সর্গ কয়টি যথাক্রমে এই—মনোরাজ্য-প্রয়াণ, নন্দনপুর-প্রয়াণ, বিলাসপুর-প্রয়াণ, বিষাদপুর-প্রয়াণ, রসাতল-প্রয়াণ, সমর-প্রয়াণ ও শান্তি-প্রয়াণ। প্রথম সর্গের সূচনাতেই কবি বলিয়া দিয়াছেন, ইহা হইল মনোরথে চড়িয়া মনোরাজ্যে যাত্রার কাহিনী। কবি নিজেই যাত্রী। ক্রমে ক্রমে ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল, অভিনব কুরুক্ষেত্র ও অন্তিম শান্তিনিকেতন এ সমস্তই মনের ভিতরে; এ-সমস্তই চিন্ময়। হর্ষ, বিলাস, বিষাদ, মূর্ছা, উদ্‌বোধ, উদ্যম, শান্তি—মনেরই বিচিত্র অবস্থা, একের সীমান্ত পার হইয়া আর-একটিতে কখন কেমন করিয়া গিয়া পড়ি তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশ ভুবন এবং সেই নিখিলভুবনাধীশ হইলেন আনন্দ, নিখিল রসের তিনিই ঘনীভূত মূর্তি, মায়া তাঁর পত্নী। অবশ্য, এ যেমন করিয়া বলা হইল, এমন করিয়া কবি বলেন নাই, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণমিশ্র নহেন। তিনি ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া, নিপুণ তুলিকাপাতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া, হাস্য করুণ বীর বীভৎস মধুর প্রভৃতি প্রত্যেকটি রসকে শরীরী করিয়া, শ্রদ্ধা প্রীতি শোভা কল্পনা প্রত্যেকেরই অধরের বিশেষ হাসিটি ও অপাঙ্গের বিশেষ দৃষ্টিটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া, প্রসাদগুণসম্পন্ন সুললিত ভাষায় ও ছন্দে, পদে পদে দ্যুতিময় স্ফটিকখণ্ডের মতো নবসৃজিত শব্দরাজি ছড়াইয়া, অভিনব অলংকার পরাইয়া, কাব্যকেই কথা বলাইয়াছেন।

ইহাতে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র রস, বিচিত্র কল্পনা—বিচিত্র পাত্রপাত্রী, বিচিত্র ঘটনা—বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচিত্র কারুকৌশল—ইহাদের একটিকে আর-একটির সঙ্গে মিলাইবার, একটির সহায়ে আর একটি গাঁথিয়া দিবার, এবং পরিণামে চিত্তচমৎকারী অপূর্ব এক স্বপ্নসৌধ গড়িয়া তুলিবার অতুলনীয় এক প্রতিভা দেখা যায়। সৌধ স্বপ্নের বটে কিন্তু গাঁথনি আলগা নয়; মর্মরে গাঁথিলে যেমন হইবার কথা—তাহার বর্ণবিভাসে জ্যোৎস্না-ধৌত মল্লিকাকুসুমদামের কথা মনে আনিলেও, তাহার কাঠিন্য ও ধৃতি তবু প্রস্তরের। বস্তুতঃ স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের স্থাপত্যোচিত এই যে নির্মাণকৌশল ইহাই এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু, বাংলাসাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই, এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর হইলেও ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই লিখিয়াছেন, 'স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারু-নৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিসকে তাহার নানা অবয়বে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।'

যেমন কোণার্ক মন্দিরের নির্মাণকৌশল তাহার একখানা ভাঙা পাথর আনিয়া বোঝানো যায় না, ক্লেশস্বীকার করিয়া কোণার্কে যাওয়া দরকার, স্বপ্ন-প্রয়াণের নির্মাণকৌশলও তেমনি অখণ্ড স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যেই পাওয়া যাইবে, বর্তমান আলোচনায় প্রমাণ আহরণ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিব না। অন্য যে একটি গুণে এই কাব্য চিরস্মরণীয় তাহার উদাহরণ তো পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, পাওয়া যায়, তাহারই দুই-চারিটি চয়ন করিয়া দিতে দোষ নাই। সে গুণ হইল ভাষা ও ভাবের চিত্রময়তা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের একখানি কাব্যের নাম—ছবি ও গান। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন, বস্তুতঃ বাঙ্ময় হইলেও কবিতায় অন্য দুই কলালক্ষ্মীর অন্য দুই জাতের প্রাসাদও বর্তমান। তবে কোনো কবির

রচনায় বা চিত্রের সাদৃশ্য অধিক দেখি, কোনো কবির রচনায় বা সংগীতের। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা প্রথমোক্ত পর্যায়ে পড়িবে।

স্বপ্ন-প্রয়াণের প্রথম পদক্ষেপেই এই ছবি ফুটিয়াছে—

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগরসীমায় যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী আইল অমনি
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥
সুকোমল চরণকমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি;
করে পদ্ম-ফুল করে দুল-দুল
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি॥

তারপর স্বপনরমণী কবির চক্ষে মুখে ঐ মায়াময় পদ্মফুল বুলাইতেই সুপ্ত কবির মোহবন্ধ খসিল, তিনি স্বপ্নে জাগিয়া উঠিলেন। এবং মনোমন্দিরে রহস্যের চাবি ঘুরাইয়া দিতেই, আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন শুনিয়াছি, গহন ছায়াপথ দিয়া মায়ারথ নামিয়া আসিল; কল্পনাকুমারী তার সারথি। কবি বলিতেছেন, সেই কল্পনা যাঁর সাহচর্যে—

বেড়াতাম কত খুসিতে হাসিতে!
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম কলপনা নাম,
নব নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে॥

রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর কথা মনে পড়ে না তা নয়—

তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে,
সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
ইত্যাদি।

তবে কল্পনা রবীন্দ্রের মানসসুন্দরীর মতো নিরুদ্দেশ তরণীর কাণ্ডারী হইয়া বসেন নাই, পার্থপ্রিয়া সুভদ্রার মতো মনোরথগামী অশ্বের বল্গাপাশ ধরিয়া হাসিতেছেন—

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ
কল্পনা মধুর হাসি, হরি-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ
শিথিল-আয়াসে লোল-দিল রাসে;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ॥
মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট;
দূর হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন শক্রধনু হর্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা করে দিগন্তের পট॥
সম্মুখে তোরণদ্বার শক্রধনু,
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্রভাসে পুলকিত-তনু।

ঘন বনচ্ছায় কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু॥
থামিল তুরঙ্গরাজি ক্ষণপরে;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী, কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে॥

কিন্তু, এভাবে চিত্র রচনার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেও বোধ হয় সমস্ত বইখানি উদ্ধৃত করিতে হয়।—

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি-উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা।
. . .
কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
. . .
যতগুলি হরিণ আছিল জাগি
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি।
নেত্র-কিসলয় স্থির করি রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর-সুধা লাগি॥

ইহার কোন্ ছবিটি চমৎকার নয়?—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ-গতি
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গ ঘেরি পরাইল পল্লব-দুকূল॥
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
"এ নহে সে" বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস॥

ইহাতে কি—

পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো

ইত্যাদি বহু অগীত গানেরও পূর্বঝংকার বাজিতে থাকে না, পূর্বরাগ ফুটিয়া ওঠে না? বস্তুতঃ পদে পদেই শব্দের কারুকার্যে, প্রকাশভঙ্গীর চারুতায় ও ভাবের বৈচিত্র্যে দ্বিজরাজকে আসন্ন-উদয় রবির পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হয় না। উপমামাত্রই একদেশিক, সুতরাং বলিতে হইবে কি, এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভাতের রবির নিকট নিশান্তের শশধর জ্যোতির ঋণ লইতে পারেন না।

কিন্তু, কেবল মধুর সুন্দর ছবিই নয়—কেবল জ্যোৎস্নার বিভাস, মলয়ের হিল্লোল,

পুষ্পের বিকাশই নয়, অন্যভাবের বর্ণনাও প্রচুর আছে। বিষাদপুর-প্রয়াণ ও রসাতল-প্রয়াণ, এই কাব্যের অপূর্ব দুইটি সর্গ। সেখানে বিষণ্ণ বা ভয়ংকরের তো কথাই নাই, কত কিছু অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার রূপ পাইয়াছে—

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আব্‌ডালে,
ছাপ্‌সি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর দিয়া ডালে।
কিম্ভূত-আকার অতি চমৎকার,
প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক-মশালে।

. . .

ডাকি-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে;
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যাময় ঘোরে।

. . .

ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল পেচক থামের মাথায়॥

. . .

ছড়ি-ভঙ্গ পড়ি'-আছে খান-কত
উঁচা উঁচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।...
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মত॥
আইল অদ্ভুত-রস দল-সনে;
নেঙচিয়া চলি-চলি' লাফ-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার ঠিক নাই তার
বসিলেন ঠেস দিয়া সহাস্য-বদনে॥...
মন্ত্রী আসি বসিল পেচক-মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায় চঞ্চুটা গুঁচায়,
কাক সে অমনি বসে কিঞ্চিৎ সরিয়া॥

. . .

বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া॥

আবার ওদিকে—

গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল!
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্।
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর
আসে ফিরে! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া-চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষপৃষ্ঠে লভে শেষ গতি!

দীর্ঘপদী এই পয়ারের ছন্দও যেমন স্বচ্ছন্দচারী, ধ্বনিও যেমন গম্ভীর, বিষয়ও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব। কালানল-প্রজ্বলিত নরকের বর্ণনা করিতে গিয়া দান্তে ইহার চেয়ে কী ভয়াল রোমহর্ষণ চিত্র আঁকিয়া থাকিবেন, অনুমান করিতে পারি না।

এইভাবে শব্দ দিয়া কেবল রূপকল্প সৃজন করা নয়, বহুবিধ নৈসর্গিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বোধও জাগাইয়া তোলা যায়, স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যে ইহাও দেখিতেছি—

জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, বলি' 'সর্ সর্'!

. . .

শ্রবণ-প্রবণ গহ্বর-ভবন
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির॥
টুং-শব্দটি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া লয় দশদিক্ করি কাড়াকাড়ি।

জানিতে ইচ্ছা করে, ধ্বনি কানে শুনিতেছি না চোখে দেখিতেছি!—

সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি চুমি।

এ ক্ষেত্রে যেন চোখ খুলিয়া শব্দের অর্থের দিকে তাকানো নিষ্প্রয়োজন, ধ্বনিতেই অভীপ্সিত চিত্র নিপুণভাবে আঁকা হইয়াছে।

এইভাবে কবিকল্পনার অনুসরণে মনোরাজ্যের লোকলোকান্তরে ফিরিয়া অবশেষে দেখি, কখন একসময় স্বপ্নদৃষ্টি আর স্বপ্নশ্রুতি দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে।—

খুলি-গেল দিগন্ত সকল-দিকে;
পর্বত-পাথার-ব্যোম দেখা দিল একৈ নিমিখে!

তখন মানসের সেই মেরুশিখরে দাঁড়াইয়া কী দেখিতেছি! কী শুনিতেছি! বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া বিশ্বেশ্বরের স্তুতিগান ধ্বনিত হইতেছে—

নানারসযুত ভব গভীর রচনা তব
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি! আদিকবি! ছন্দে উঠে শশিরবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-ভাতি জ্বলদ্-অক্ষর-পাঁতি,
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্তন করে
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে॥

. . .

আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে
কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রতারা।
তোমারই এ রচনারই ভাব ল'য়ে নরনারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা॥

৪

স্বপ্ন-প্রয়াণে কবিত্বসম্পদের দিক দিয়া যেমন কবিত্বকৌশলের দিক দিয়াও তেমনি বহুবিচিত্রতা আছে। ছন্দের আছে নূতনত্ব। এই কাব্যে ব্যবহৃত সকলপ্রকার ছন্দই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচারী; চরণে চরণে মিল বা মিত্রতা থাকিলেও, মাইকেলি অমিত্রপয়ারের তুলনাতেও

যতিপাতের স্বাধীনতা বা 'প্রবহমানতা' তাহাদের কম নয়। পূর্বের বহু উদ্ধৃতিতে ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। মিলযুক্ত পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে অমিত্রপয়ারের আসল গুণ মিলাইয়া উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দে বহু কবিতা লিখিয়াছেন, 'সমুদ্রের প্রতি' বা 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় যাহার প্রকৃতি জানা যায়, তাহার ইঙ্গিত কি স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্য হইতে আসে নাই?—

কখনো বনে· পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক, কোথা পিক না জানি ডাকে॥...
নমনা নামি নামি ঊর্ধ্বগামী হইয়া উঠি
বহে বিপুলভার; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি॥

ইহার ছন্দই কি রবীন্দ্র-প্রতিভায় নিখুঁত ও বিচিত্র হইয়া মানসীকাব্যের 'বধূ' হইতে মহুয়ার 'সাগরিকা' পর্যন্ত বহু কবিতাকেই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশের ঘাটে বরণ করিয়া আনে নাই?

দ্বিজেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও অতুলনীয়। বিষয় অনুযায়ী শব্দের ভোল বদল হইয়া যায়, ধ্বনি ও ধ্বনির অনুষঙ্গ একরূপ রাখেন না। একেবারে অভিজাত ও সাহিত্যিক, একেবারে ঘরোয়া ও লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা, আর তাহারই মাঝে মাঝে উদ্ভাবিত বা উদ্ভূত আনকোরা কত নূতন শব্দ—এ সমস্তই কবি কী আশ্চর্য কৌশলে মিলাইয়াছেন, গুরুচণ্ডালী দোষ হয় নাই, কোথাও তাল কাটে নাই, সেই এক বিস্ময়ের বিষয়। বুঝিতে পারি, ভাষার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের কী দখল ছিল, কী সাহস ছিল, কী দরদ ছিল এবং কী ভাবে তিনি ভাষার প্রকৃতি ও ভাষার মেজাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান করিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন।

বস্তুতঃ স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের ছন্দ ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াই স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে যোগ্যতরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

৫

খাঁটি ভারতীয় কল্পনায় ও খাঁটি বাংলাভাষায় লেখা হইলেও স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি আজ হারাইয়া গেছে। সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালিজাতিকেও চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির রাগে রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে অমরতা না পাইলে, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যে কী ছিল ও কেমন ছিল মনে আনা দুরূহ হইত। সে তো কেবল এক ধনীপরিবারের বসতবাটি ছিল না। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ব্রহ্মবিদ্যা ও কলাবিদ্যা, ধর্ম ও কর্ম—এ সকলেরই সে যে মিলনভূমি ছিল। সেই তীর্থের পুণ্যোদকেই বাংলার ভবিষ্যতেরও অভিষেক হইয়াছে। ইহারই অন্যতম পুরোহিত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

স্বপ্ন-প্রয়াণ হাতে লইয়া দক্ষিণের সেই বারান্দা মনে আনিতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণের বারান্দায় শুভ্র ফরাশ পাতা, ছোটো ডেস্‌কোখানি পাতিয়া কবি তাঁহার কাব্য লিখিতেছেন। বসন্তের বনে যেমন অজস্র মুকুল ধরে, অজস্র ফুল ঝরিয়া যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখাও সেইরূপ। মালায় গাঁথা হইয়াছে অল্প, হেলাফেলায় হারাইয়া গেল অনেক। তাঁহার কাব্য-সৃজনের তুলনায় বন্ধুবান্ধব লইয়া কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দও কিছুমাত্র কম নয়—তাহারই আড়াল-আবডালে থাকিয়া বালক রবীন্দ্রনাথও সে আনন্দের অংশ পাইয়াছেন—কবি কখনও তাঁর মধুরগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন, কখনও তাঁর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যে ছাদ-

বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে সময় কবির হাতের কাছে কাব্যিক বা অন্যাবিধ রসলুব্ধ যে অভাগার পিঠখানা আছে তাহার দশা ভাবিয়া দুঃখ হয়।

ক্রমে এই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গহনে পথ হারাইলেন। কবিপ্রকৃতি ও শিশুপ্রকৃতি আমরণকাল অম্লান অটুট থাকিলেও, কবিতাসুন্দরীর চরণবন্দনা চুকাইয়া দিয়া, জীবনসাধক জীবনরসিক মহাপুরুষ শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লইলেন, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে আশ্রমকে আশ্রম বলিয়া মনে হইল।

মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভা[১], তাহার সমাদর ও সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহারই মতো আর কোনো কবি অমরতায় উত্তীর্ণ হন নাই। শৈবালে সে পথ ঢাকা পড়িয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি নিজেই নিজের কাব্যসাধনাকে রচনা হইতে রচনান্তরের ভিতর দিয়া পরমা সিদ্ধির অভিমুখে লইয়া যান নাই। কাব্যসাধনার এ যে একটা নূতন দিক, এবং ইহার সম্ভাবনাও যে অপরিসীম, সে কথা অন্য কোনো কবির মনে উদয় হয় নাই।

যুগের পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। হয়তো অন্য কোনো যুগান্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হইবে (স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হইলেও, কালের প্রবাহে বা মানস উপপ্লবে, একেবারে ডুবিবে না) এবং অন্য কোনো কবি তাঁহারই পথে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিনব অমরতার অধিকারী হইবেন।

১৩৫২

[১] শোনা যায়, একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ মাইকেল মধুসূদন মাথার টুপি খুলিতে রাজি ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা থাকা আবশ্যক। ঐ গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা যথোচিত ফল ফলাইতে পারে না, কিম্বা যে ফল ফলিয়াছে তাহাও সাজাইয়া গুছাইয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারে না। ঐ গৃহিণীপনা থাকিলে কেবল একটিমাত্র রচনার জোরেও লেখক টিঁকিয়া থাকে, যেমন ফিট্‌জেরাল্ড ওমর খৈয়ামের অনুবাদের জোরে টিঁকিয়া আছেন। আবার ঐ গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া যান। যেমন ওদেশে ল্যান্‌ডর, এদেশে রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্র। আমরা সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অসামান্য। তৎকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পড়িয়া মধুসূদন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।[১] আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন, অযথা প্রশংসা করিবার লোক তিনি ছিলেন না; তিনিও স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।[২] রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে স্বপ্নপ্রয়াণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ সব ছাড়া আরো তিনটি রচনা আমার চোখে পড়িয়াছে।[৩] কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, সামান্য কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন প্রজন্মকাল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। মাইকেল ছাড়া আর সকলেই তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণের গুণানুকীর্তন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—সকলেই একবাক্যে এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস দিয়াছেন।[৪]

কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে দেখা যাইতেছে যে উচ্চ আদালতের রায় কাব্যের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও কবির বিশেষ লাভ হয় নাই। তিনি নামে মাত্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের নামটাও বোধ করি অনেকেরই স্মৃতির অতীত! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গৃহিণীপনার অভাবই কি ইহার কারণ! আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আরো কিছু কারণ আছে, আর সে-কারণ কালধর্মে ও পরবর্তী কাব্যধর্মে নিহিত। স্বপ্নপ্রয়াণের মতো অমর কাব্যের বিস্মৃতিতে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যেরও

১ "আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; মেঘদূত প'ড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।"

—পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়

মধুসূদন যে "দেবেন্দ্র ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কবিত্বে" মুগ্ধ ছিলেন এমন মন্তব্য অন্যত্রও দেখিয়াছি।

২ "আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious! যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে somehow or other it never came to the surface."

—পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়

৩ সতীশচন্দ্র রায়, রচনাবলী; প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি; শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৭৩। তিনটিই বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত।

৪ স্বপ্ন-প্রয়াণ গ্রন্থাকারে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭৩ সালে অংশতঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ মাইকেলের মৃত্যুর বৎসর। মাইকেলের চোখে পড়িলে এই অপূর্ব কাব্যের তিনি প্রশংসা করিতেন বলিয়াই আমার ধারণা।

পরিচয় নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অনুসন্ধানে নামিলে একাধিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতেছি।

২

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিদিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্রাগ্রজরূপে যে কৌতূহল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই এমনটি হইয়াছে। নতুবা নিজেকে বিদিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা বলা যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল তাঁহার জীবন নয়। এখানে কেবল সেই সকল তথ্যেরই উল্লেখ করিব বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘদূত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারতী, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহর্ষির মৃত্যু হইলে ১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে এই মহানুভব মনীষী লোকান্তরে প্রয়াণ করেন। পঁচাশি বছরের বেশি এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমুষ্টির অধিক নয়। তাই বলিয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রন্থাবলী-আকারে ছাপিলে মধুসূদন ও বঙ্কিম-চন্দ্রের যুক্ত রচনাসমষ্টিকে অতিক্রম করিবে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেজমিনে সে পরীক্ষা না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি।[৫]—

১ মেঘদূত	১৮৬০
২ তত্ত্ববিদ্যা ৪ খণ্ড	১৮৬৬-১৮৬৯
৩ স্বপ্নপ্রয়াণ	১৮৭৫
৪ পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম	১৮৯৮
৫ রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৯১২

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় নয়। কেননা, গদ্য ও পদ্য ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। জ্যামিতি, স্বরলিপি উদ্ভাবন,

[৫] পূর্ণতর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", সাহিত্যসাধকচরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কাগজের বাক্স রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন ও বাংলা শর্টহ্যান্ড অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিণীপনা থাকিলে ইহাদের যে-কোনো একটি ধারাকে অনুসরণ করিয়া লোকে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কোনো পথেরই চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবার চেষ্টা করেন নাই; শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহিণীপনার অভাব। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রতিভার প্রাচুর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—"বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।"

এই উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধর্ম। গদ্য পদ্য ও বিচিত্রমুখী রচনার কোনোটাতেই তাঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নাই। তাঁহার রচনা পড়িতে শুরু করিলে মনে হয় ভান্ডারের চরম রত্নগুলি যেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অস্পষ্ট অতৃপ্তি পাঠকের মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবদন্তীতে ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি?

এ উদাসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত স্বভাব। তিনি দার্শনিক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার সাংসারিক অনাসক্তির একটি উদাহরণ দিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন—

"পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাযথ ভাবে বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহারবস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন, সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলছেন, দীপুকে গিয়ে বলিস আজ যদি আমায় একটি দোয়ানি দেন তবে আমি একখানি খাতা আনাই। একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি।"

যে উদাসীনতা তাঁহাকে একটি দোয়ানি সঞ্চয় করিয়া দেয় নাই, সেই উদাসীনতার উত্তরে বাতাসে "স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত।" আবার, সেই উদাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এই উদাসীনতা ও রবীন্দ্রনাথ-কথিত গৃহিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার মতো। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীস্বভাব নিহিত থাকে, সেটি গৃহিণীপনার ভার লয়। এখন, পুরুষ যোল আনা পুরুষ হইলে গৃহিণীপনার সুবিধাটুকু হইতে সে বঞ্চিত হয়। তাহার অসুবিধার অন্ত থাকে না। একটি অসুবিধা আত্মপ্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা। সংসারে যেখানে যে-কেহ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম কয়খানি ইঁট তাহাকে স্বহস্তে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে অপরে ইমারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এতটুকুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এ যুগে এ রকম মনোবৃত্তি একান্ত বিরল।

৩

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম কি? তিনি মূলতঃ কবি না দার্শনিক? এ তর্কের মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার হইয়া

যাইবে। প্রথম-যৌবনে তিনি কিছুকাল কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাব্যরচনা করেন নাই, তত্ত্ববিদ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোল্‌রিজের সাহিত্যজীবনের সংগে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য তাহা প্রথমজীবনের রচনা, শেষজীবন দর্শন ও সমালোচনাতত্ত্ব লিখিয়া তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। আবার, দুজনেরই কবিকল্পনা কিঞ্চিৎ উন্মার্গগামী, অলৌকিকের পাড়ায় তাঁহাদের গতিবিধি। কোল্‌রিজের এনশেণ্ট ম্যারিনার, কুব্‌লা খাঁ ও ক্রীস্টাবেল, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সত্ত্বেও দুজনের প্রতিভার ধর্ম ভিন্ন, কোল্‌রিজ মূলতঃ কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শনিক।

স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে গ্রথিত; ইহার কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসঞ্জীবন-মন্ত্র কল্পনার। স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে—আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তত্ত্ববিদ্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত। এই একটি কারণ যে-জন্য তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তাত্ত্বিক প্রতিভা বলিতে চাই।

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্ত্বে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাষারীতি সর্বত্র গদ্যাত্মক, অর্থাৎ যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যে ভাষারীতি বা স্টাইল যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া, শৃঙ্খলার ছত্রভঙ্গ করিয়া উধাও হইয়া যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে খুঁজিলে মিলিবে না, মিলিবে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির জনক।

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম,
বলিল "যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম!
ভঙ্গ-দিতে রণে
পারি বা কেমনে?
অতএব দেখ' মোর সাহসের কর্ম!"

কিংবা—

সেই দশা করেছ আমার—চাই রাখ' চাই মার'!
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার'
নয়ন-ভঙ্গিতে! বল' বল' তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্মভেদী ঋণ!

আর—

"এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্‌গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য ঈশ্বরের মহিমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হয় নাই।"

আরও—

"কপিল মুনি জিহবা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, 'যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়' কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না, তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ।"

এই চারটি অংশ, দুটি গদ্যের দুটি পদ্যের, একই ধর্মবিশিষ্ট, কেবল ছন্দের গুণে একটি পদ্য, ছন্দের অভাবে একটি গদ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের সৃষ্টি যে-মনে, সে-মন গদ্যলেখকের ও তাত্ত্বিকের, যুক্তিশৃংখলা ও প্রাঞ্জলতার ধাপ ফেলিয়া যে-মন অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত।

এখানে একবার অনুজে অগ্রজে তুলনার লোভ সংবরণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কাব্য তত্ত্বপ্রবন্ধ গল্প যাহাই লিখুন-না কেন সর্বত্র তাঁহার কবিধর্ম ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যেও তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বেও কবি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্যের বুনন যেমন গদ্যাত্মক. রবীন্দ্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত; তাঁহার গদ্য পদ্যাত্মক। সংস্কৃত অলংকার ও ইংরেজি বাক্যের প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটার্নটা একেবারেই দেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইডিয়ম, কিছু সংস্কৃত ভাষ্যের গদ্যরীতি। আবার দুজনের প্রতিভার ধর্মও ভিন্ন, একজন শৃংখলা, যুক্তি ও প্রাঞ্জলতার পথিক, অপরজনে এসব গুণ তেমন লক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি রূপককে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ রূপকের আঙ্গিকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ একই বাড়ির এ-বারান্দা ও-বারান্দার অধিবাসী; এমন ক্ষেত্রে আশা করা অন্যায় নয় যে, অগ্রজ প্রভূত পরিমাণে অনুজকে প্রভাবিত করিবেন। কিন্তু তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ঐকান্তিক পার্থক্য। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুবাদে বিহারীলাল স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আর অধিকতর শক্তিমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ চিরকালই বিস্মৃতির ধার ঘেঁষিয়া রহিয়া গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বাপর নাই; জীবনের ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে স্মরণীয় করিয়া রাখে। উত্তরপুরুষহীন সাহিত্যিক সত্যই ভাগ্যহীন, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই দলের একজন। অনেকে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে একখণ্ড দ্বীপ বলিয়াছেন। আমি তো বলি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই একখণ্ড দ্বীপ। প্রাচীন ধারার সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিন্ন, আবার নূতন ধারার সঙ্গেও যোগ গড়িয়া ওঠে নাই, আবার তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার ধারেন না। তাঁহার উত্তরপুরুষ নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষই বা কে? মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র কাহারও সঙ্গে তাঁহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি? পূর্বাপরহীন তিনি নিঃসঙ্গ একক, দ্বীপখণ্ড বলিলেও যথেষ্ট বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা যুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন গ্রহান্তরের উল্কাখণ্ড, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত।

আমার সিদ্ধান্ত এখন দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

"আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে।... আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি।...কখনও আমি বাড়ির বাহিরে কোন একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না।...দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের

ফ্যাশান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism বার আনা বিলাতি চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot আমিও সেই রকম patriot হব, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল?"

আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আমার মত patriot' না হইবার চেষ্টা করিয়া 'তোমার মত patriot' হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল জিনিস যেমন চলে আসল তেমন চলে না। কালের সহিত আপস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-জাহ্নবী নূতন পথে চলিয়া গেল; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, শূন্য প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন; তবে পুরাতন সেই শ্বেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কূলেই নদী বহিত, এখন সব পরিত্যক্ত।

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। সে একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি কামার কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?···মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম, 'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।"

ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসীকে করজোড়ে বসাইয়া ছবি আঁকিতে সেকালের পেট্রিয়টদের বাধিত না, পেট্রিয়ট না হইয়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের সঙ্গে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বেশি মিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। একালের আমরা ব্রিটানিয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া ছবি আঁকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা যে বসিতেন তাহাতে ভুল নাই। ইহাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও 'আমার মত patriot' হওয়া নয়, 'তোমার মত patriot' হওয়ারই রকমফের। শকুন্তলা যদি ভেনাসের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই হইল; ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই হইল—এই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিমত, ইহাকেই তিনি বলিতেন 'তোমার মত patriot' হওয়া। সেদিনের মতো ছবিখানা উল্‌টাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবৎকাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে। পরবর্তী কাল কালদ্রোহী দ্বিজেন্দ্রনাথের ছবিখানাই উল্‌টাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই যুগজীবনে তাঁহাকে নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক বিচিত্র কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের স্রষ্টা—দুই-ই নিজ নিজ পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত।

৪

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, আর অল্পই বাকি আছে, সেইটুকু আমি গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রিয়নাথ সেন স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইন ও বানিয়ানের পিল্‌গ্রিমস্‌ প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে—সেখানি দান্তের ডিভাইন কমেডি। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তিনখানির কোনোটির সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের একাসন নয়। আবার তিনখানির কোনোটির দ্বারা যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসত্ত্বেও দুখানির সঙ্গে যদি তুলনা চলে, তৃতীয়খানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের মিল যদি আকস্মিক হয়, তৃতীয়খানির সঙ্গেও তাই। কিন্তু তৃতীয়খানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভার্জিল। তাঁহার পরিচালনায় দান্তে নরক ও Purgatory-র যাবতীয় রহস্য দর্শন করিয়া অবশেষে বিয়াত্রিচের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অনুরূপ। এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্য কোনো কবি নয়, স্বয়ং কবিকল্পনা। তাঁহার পরিচালনায় কবি মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, সমরপুর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে পোঁছিয়া সপ্তসর্গে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন। ডিভাইন কমেডি শান্তিময় প্যারাডাইসে এবং স্বপ্নপ্রয়াণ শান্তিময় শান্তিপুরে উপসংহৃত। এ দুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবিটি কে? প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন—"একজন কবি বা কবিপ্রকৃতি লোক।" আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বয়ং, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি।

ইহা স্পষ্টতঃই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।[৬] এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্নপ্রয়াণের নায়কের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয় থাকা উচিত নয়। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আর-একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনী, রূপকচ্ছলে এই কাব্যে তিনি তাঁহার জীবনের ও তথা কবিজীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিতার্থতা বিবৃত করিয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়কত্ব পর্যন্ত ডিভাইন কমেডির সঙ্গে মেলে। এ মিল আকস্মিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিক্রমকারী, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই কাব্যের অমিলের কথা তুলিব। স্বপ্নপ্রয়াণ লেখকের মানসজীবনের ইতিহাস। ডিভাইন কমেডিতে তৎকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি দান্তে মোক্ষকামী মানবমাত্রেরই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, গভীরতায়, কাব্যোৎকর্ষে দুয়ে তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোর অতিপ্রকট মিলটা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এবারে আর-একটি কথা। নানা কারণে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য স্মরণীয়। মেঘনাদবধ-কাব্যখানিকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক দীর্ঘকাব্য। বাংলা সাহিত্যে

[৬] সত্য=সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম=হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণ=গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি =জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোম=সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবি=রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবনিকেতন= মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন, কবি=দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইহাই একমাত্র সার্থক রূপককাব্য। মধুসূদনী কাব্যরীতি ও রবীন্দ্রকাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের বিচারেও ইহার স্থান কাব্য-রীতি ও ফ্যাশন-পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য নানাভাবে স্মরণীয়। এসব কথা অল্পবিস্তর সবাই জানেন, অনেকেই বলিয়াছেন। আরো একটি কারণে ইহার অনন্যসাধারণত্ব আছে। বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। প্রায় সমসাময়িক সারদামঙ্গল কাব্যেও কবিজীবনের ইতিহাস আছে কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক; তাছাড়া "মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহের" সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবিজীবনকে সঠিকভাবে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কাব্যোৎকর্ষেও দুয়ে ভেদ আছে। সারদামঙ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পষ্ট, স্বপ্নপ্রয়াণ স্পষ্টতায় ও শৈত্যে শ্বেতপাথরের মূর্তি; সারদামঙ্গল কাব্যের নীহারিকা, স্বপ্নপ্রয়াণ শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ও অচপল। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'তে কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের পরবর্তী রচনা। কবিজীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কৃতিত্ব। আর, নিজের অজ্ঞাতসারে এই কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের রোমাণ্টিক কাব্যরীতিতে তিনি নূতন প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

তার পরে যখন মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদর্শিকা করিয়াছেন তখন ওয়ার্ডস্বার্থ-কোল্‌রিজের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বের সমত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোল্‌রিজ সর্বপ্রথমে কবি ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম বৃত্তিমাত্র ছিল। রোমাণ্টিক কাব্যের পুরোধাদ্বয় কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, আর কবিকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারথ্য প্রদান করিলেন। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে কবি ও কল্পনার সেই নূতন অর্থই আমরা পাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে ইহার আগে মধুসূদন 'মধুকরী কল্পনা'কে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এ 'মধুকরী কল্পনা' রোমাণ্টিক পুষ্পবনের ভ্রমরী নয়, অষ্টাদশ শতকের কাঁচি-ছাটাই সযত্নলালিত উদ্যানের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের 'কবিতাকল্পনালতা'র সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট-এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর-একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'রবি উদয়ের' আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে স্বপ্নপ্রয়াণে সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য 'প্রভাতসংগীতে'র পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মমুহূর্তের সংগীত'; স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নির্ঝরকে যেন দেখিতে পাই।

৫

রূপক কাব্য যতই প্রাঞ্জল হোক, কাহিনী-কাব্যের প্রাঞ্জলতা কখনো পাইতে পারে না। যুগপৎ কাহিনী ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কখনো সে জটিলতা ফেয়ারী কুইন-এর দুর্গমতায় পরিণত হয়, কখনো অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। স্বপ্নপ্রয়াণের গতি সরল, বিন্যাস প্রাঞ্জল আর অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই।

তবু রূপক কাব্যে যেটুকু দুরূহত্ব অনিবার্য তাহা অবশ্যই আছে। ইহারই সমাধানমানসে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে দুই-চার ছত্র গদ্য 'সূচনা' যোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাতে সমগ্রের অর্থবোধে সাহায্য হইতে পারে।

প্রথম সর্গ। মনোরাজ্য-প্রয়াণ। স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেকদিন পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গ। নন্দনপুর-প্রয়াণ। কবির বাল্যকালের আনন্দনিকেতন। কবি বাল্য-কালে চিত্রকর্ম সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত, পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়া-মমতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরন্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্যরসাস্বাদনশক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব, মাধুর্যগুণ। শরন্ময়ী কিনা শারদীয় ভাব—প্রসাদগুণ।

তৃতীয় সর্গ। বিলাসপুর-প্রয়াণ। নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধুলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে কবি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুরে হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল—এ ঘটনাটিও কবির দুঃখানলে আহুতি দিল।

চতুর্থ সর্গ। বিষাদপুর-প্রয়াণ। কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদপুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানাপ্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রাজা হাহাহুহু গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

পঞ্চম সর্গ। রসাতল-প্রয়াণ। জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভক্ত অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতলপতি ভয়ানক-রসের নিকটে সঁপিয়া দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে ভৈরব নামক একজন করালমূর্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলিদান দিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে উদ্ধার করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। সমর-প্রয়াণ। বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সপ্তম সর্গ। শান্তি-প্রয়াণ। রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তিসকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভপরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

৬

কবি-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি না দেখা যাক।

স্বপ্নাবিষ্ট কবি কল্পনার সারথ্যে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন। নন্দনপুরকে aesthetic-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে মানুষ প্রথমে aesthetic জগতে আসিয়া পৌঁছায়। এখানে তাহাকে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলাকৈবল্য বা art for art's sake তত্ত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথভ্রান্তি ও পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা ঘেঁষিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্য পরিণাম তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছে। বিলাসপুরের অধীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদবাজের প্রভাবে "লালসা নাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে" কবি হারাইয়াছেন। এবারে তাঁহার দুঃখের পালা শুরু। কল্পনাকে হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হাস্যরসের নষ্টামির ফলে কবি সোজা বিষাদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। "কবি বিষাদপুরের রাজা হাহাহুহু গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল।" অবশেষে কবি রসাতলে গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমুহূর্তে তিনি করুণা দেবীর কৃপায় উদ্ধার পাইলেন। পরে সমরপ্রয়াণ। এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া ভয়ানক রসের পরাজয় ঘটিল এবং বীর কর্তৃক কবি শান্তিপুরে নীত হইলেন। শান্তিপুরের নৃপতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুসঙ্গের কল্যাণে কবির সহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর সে মিলন বিবাহবন্ধনে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে আরো দুটি বিবাহ হইল।

আনন্দভূপ বলিলেন—

> হও এস সংসারধরমে ব্রতী।
> কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
> প্রমদা-ললনা,
> শোভা, কলপনা,
> এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী।

প্রমদার সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত কল্পনার বিবাহ হইয়া গেল—আনন্দনৃপতি তিনে এক কন্যাকর্তা।

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভূতিস্বয়রূপে এবং প্রমদা (আনন্দদানশক্তি) ও শোভাকে (সৌন্দর্য) কল্পনার বিভূতিস্বয়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাহিনীবিন্যাসের খাতিরে তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন। ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিণী ও আনন্দদায়িনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব।

নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; কিন্তু শান্তিপুরে যে

কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধন মাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for life's sake-নয়, এখন art for art's sake-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলিয়াছেন—

"পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।...এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ-বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলাচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"[৭]

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌন্দর্যের চেয়ে তাহার তত্ত্বের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারের দিকে তেমন মন দেওয়া হয় নাই, কেবল প্রিয়নাথ সেনের রচনাটিতে কিছু পরিচয় আছে। দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বপ্ন-প্রয়াণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত।

৭

নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যই একমাত্র মহৎ ও দীর্ঘাঙ্গ কাব্য, আপন গঠনসৌকর্যের বলে যাহা দণ্ডায়মান। সর্গের সহিত সর্গ গ্রথিত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা যুক্ত হইয়া অভ্রান্ত লক্ষ্যে ও অমন্থর গতিতে তাহা চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে, সুচালিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যব্যূহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যগুলির আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো তাঁহাদের কিছু কিছু গুণগ্রাহী ব্যক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্তর্নিহিত অনিবার্য কোনো নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়—ওসব যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাঁধনটা নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্তুও পাঁচ দোকান ঘুরিয়া সংগৃহীত। স্বপ্নপ্রয়াণের architectonics বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রান্ত হইবার বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব—সে নিজেই ছায়াময়, অলক্ষ্য-প্রায় তাহার গতিবিধি, তৎসত্ত্বেও কবি যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। এই কার্যে তাঁহার সহায় তাঁহার অসামান্য সংযম। যেখানে একটি বিশেষণে চলে সেখানে দুটি তিনি ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দিকেই তাঁহার নজর। অযথা শব্দপ্রয়োগ ও ঘটনাবিস্তার তাঁহার দু চক্ষের বিষ। কাব্যের প্রতিটি সর্গ ছন্দ নৌকার মতো হালকা ও তীব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বর্জিত। অথচ যখন মনে পড়ে যে, লৌকিক ও কিম্ভূত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি পদে পদে কি আত্মসংযম না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এ দিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প। অন্য দিকে কল্পনার deification-এ বা দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা রোমান্টিক কাব্যেরও পূর্বসূত্র বটে। শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাংশে

[৭] প্রিয়নাথ সেন।

রোমাণ্টিক রীতিকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নপ্রয়াণ যে নূতন কাব্যধারা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এই ধারাকে হয়তো সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই যে তিনি শান্তিপ্রয়াণ-অন্তে তত্ত্বপ্রয়াণ করিলেন, নূতন কাব্যপ্রয়াণ আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। কল্পনা যতদিন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, স্বকীয়া হইবার পরে তিনি আর তাহার প্রতি ফিরিয়া তাকান নাই। কি বিড়ম্বনা!

৮

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শিল্পকুশলতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও উদাহরণযোগে নিজেদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল না, 'এল ডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকীর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে-কোনো পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সৌন্দর্যসৃষ্টির পরেই লক্ষণীয় তাঁহার সাজসজ্জা ও ভাষাব্যবহারকৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইডিয়ম ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে বিস্মিত করিয়া দেয়। এক-একবার আচমকা মনে হয়, এই বুঝি যথার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।' শ্রীকানাই সামন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেনা যায় না।" চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে ভদ্রেতর বাঙালী যে ভাষা বলিত এখন তাহা বলে না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মুখ হইতে মাতৃভাষা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছি তাহা হয়তো অধিকতর ঐশ্বর্যময়, কিন্তু অকৃত্রিম বাংলা যে নয় সে কথা সুনিশ্চিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।"

কিন্তু কৃষ্ণকমলের মতো বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ভাষান্তর, ভাষা-ভাগীরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দু-চার কথায় সারিবার মতো নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম কারণ, ইহার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আয়াস স্বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমাণিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলাদেশে যে-কয়জন ক্ষুরধারমেধাবিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, logical mind-এর চূড়ান্ত বিকাশ যাঁহাদের মধ্যে হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। এ হেন ব্যক্তির হাতে

স্বপ্ন ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচিত্র কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যই এক বিস্ময়ের বস্তু। মেঘনাদবধ কাব্যের মতোই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্যবঞ্চিত। কিন্তু ইহাদের অমরত্বের জন্য উত্তরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্থ সৃষ্টি না হইলে মেঘনাদবধ কাব্যের নিঃসঙ্গ মহিমা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্নপ্রয়াণের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষেরও অভাব—সমস্ত কৃতার্থতা নিজের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিস্ময় আপনাতে আপনি অটল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

পরিশিষ্ট

···এক ঘরে গিয়া কবি (রবীন্দ্রনাথ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে···দেখিতে পাইলাম। দুজনকেই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিলাম।—পরে রবিবাবু আমাকে তাঁহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন 'তাই বটে? তোমার সমালোচনাটি বড় ঠিক হয়েছে। বড় আশ্চর্য! তুমি কেমন করে আমাকে ঠিক্ ঠাক্ ধরলে?···তুমি আমার মনের কথাগুলি কেমন করে জান্‌লে হে?' ইত্যাদি। ক্রমে নানা কথাবার্তায় পরিচয় হইতে লাগিল।

এখন দ্বিজেনবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় দেখাইতেছি। প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের।

এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত করা খুব কঠিন নয় provided তোমার প্রাণ থাকে। তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য বুঝিতে পারিবে না—এমন কি একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি কি নির্বিশেষেই ভোলানাথের admirer? আমি ত নই। এক রকম ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র carelessness বা 'হযবরল'ত্ব হইতে জন্মিয়া থাকে—তাহাকে আমি admirable মনে করি না—এই-সব ভোলানাথদের বাহিরও যেমন শিথিল অন্তরও তেমনি শিথিল। হৃদয়ে কোন গভীর স্রোত নাই, এমন কি হৃদয় নিতান্ত মলিন। অবশ্য এদের মধ্যে helplessness-এর একটা সৌন্দর্য থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ কি admirable! ইহারা সব idea-র ভোলানাথ। Art বল, Philosophy বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্রবাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে তা নয়। Genius-এর মত আছে, বা Originally আছে। তিনি Modern Literature হয়ত জানেন না (আমি খুব modern এর কথাই বলিতেছি) অথচ তাহার কোন ভাব ইঁহার অনায়ত্ত নাই, ইনি originally সে সব জানেন। তা ত হইবেই, কবিতা পড়িয়াই বুঝিতে পার। বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি আধুনিক কালে আর কেউ আছে—তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন 'তখন (যৌবনে) আমি কবিতা অনেক সময়ে লিখিতেই পারিতাম না, ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতলা কামরায় থাকিতাম, সামনে একটা বাগান, দূরে একটা পুকুর করে আমি মনে কর্তুম এই উপবন এই সরোবর ইত্যাদি। Nature-এর scenery-তে বিভোর হয়ে থাক্‌তুম। চাঁদকে যে আমি কি ভালবাসতুম সে আর বল্‌তে পারিনে। তোমাদের এই Keats-এর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে—আমারও অনেকটা এই রকম ভাব ছিল।' এই বলিয়া Keats-এর St. Agnes' Eve হইতে

> "St. Agnes' Eve—Ah! bitter chill it was!
> The owl for all his feathers was a-cold."

এই প্রথম লাইন দুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কবিতার সঙ্গে Keats এর কবিতার সৌসাদৃশ্য আছে—নয় কি?

পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি—শুন! একদিন একটি বিছানায় পাতিবার লাল কম্বল গায়ে দিয়া উপস্থিত—সে আবার ময়লা। ইনি সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। আসিয়া এখানে এ-কথা ও-কথা বলিতে বলিতে যদি একবার ধরিলেন ত—Kant, Spinoza, Herbert Spencer, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইঁহার মতগুলি মতামত সমস্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন—দু'একবার হয়ত বলিলেন 'আপনাদের আমি

detain কচ্ছি কি?' আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে যাইব এই যোগাড় দেখিয়া 'ও, তবে আপনাদের খাবার এসেছে' বলে—দুতিনবার বলে—ধীরে ধীরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'তবে এখন পালাই' বলিয়া চলিয়া যান।

হয়ত কিছুদূর আলাপ করিতে করিতেই নিজের খাতাটি বাহির করিয়া 'আপনারা আমার এই সার সত্যের আলোচনাটি শুনবেন কি?' এই বলিয়া আমাদের মত একটু সংকোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন এবং পাঠান্তে আমাদের মত সংকোচের সঙ্গে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন হইয়াছে?' 'ভাল হইয়াছে' শুনিলে 'এ, ভালো হইয়াছে?' বলিয়া প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ এত সরল লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই! বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আজ সকালবেলা Maeterlinck-এর *Wisdom and Destiny* অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা Maeterlinck করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহংকার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখী শয়ান, অভিভূতব্য চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা Wisdom। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আছে।

তিনি বলেন 'কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় Philosophy কি করে পড়তে আরম্ভ করবে তা হ'লে আমি ঠিক পেয়ে উঠি না তাকে কি উপদেশ দেব! তাকে কি পড়তে বলব! Philosophy পড়বে? কেন পড়বে? তোমার কি দরকার? এই প্রশ্নটি আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়।' ভাবিয়া দেখ কি গভীর! আমরা এই রকম করিয়া যদি জ্ঞানোপার্জন করিতে যাই তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না কি? একটা জিনিস কেন পড়ি? টাকা—নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাফলানের জন্য—নয়ত গড্ডালিকা-প্রবাহে চলন! কিন্তু বাস্তবিক আমার Humanity গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া হাঁ করিয়া খাইতে চায়—Spiritual Life ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, তার ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, অংক—কিছু একটা পড়িব—এভাবে ক'জন পড়ে?

Life-এর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাঁধে চড়িয়া বসে—আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয়—এ বিদ্যায় জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে—অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন দোমেটে জ্ঞান—অর্থাৎ কিনা অসরল জ্ঞান—আমার যাহা common sense আছে তার উপর বিদ্যা লেপিয়া দিলাম। ইহা অজ্ঞান—ইহার উপর যদি আবার তা নিয়ে অহংকার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক) তাহা হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষায়)।

এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্ জায়গাটিতে দাঁড়াইয়াছেন—অর্থাৎ প্রকৃত wisdom-এর উপরে। বাস্তবিক এক-এক সময় ঐ সরল হৃদয়টি ভেদ করিয়া যে গভীর অধ্যাত্ম-ব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয় না স্পর্শ করে সে পাষাণ হইতে পাষাণ। আমার চিরদিন এই দৃশ্যটি মনে থাকিবে—

রাত্রি প্রায় এগারোটা! শান্তিনিকেতনের নীচের বৈঠকখানায় couch-এ শুইয়া সেই বৃদ্ধ কবি—পাশে চেয়ারে বসিয়া আমি। ঐ পাশে চেয়ারে গ্লোবের মধ্যে মোমের বাতি জ্বলিতেছে। বুড়ার মাথাটির দৃঢ় সারল্যব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি—উন্নত কপালের চৌদিকে পিছে উঠান সাদা চুল। নাকের উপর চস্‌মা আলোতে চক্ চক্ করিতেছে—এক-এক সময়ে চক্ষুটি জ্বলিয়া উঠিতেছে।...

প্রকৃত idealist-এর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে ইঁহারা যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য,

কি তীব্রতা, কি তেজ স্ফুরিত হইতে বাধ্য। আমরা যাহাকে ভালবাসি তার কথা বলিতে গেলে তার মধ্যে কি একটা মর্মঘাতী সুর থাকে ভাব দেখি।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে এই দু'দিনে কালীবর বেদান্তবাগীশের কথা কয়েকবার শুনা গেল। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মূর্তি আমি দেখিয়াছি।···কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথা পাড়িয়া বলিলেন 'বাস্তবিক, আমাদের দেশে রাজা রাজ্‌ড়ারা যে কেমন, ওঁকে patronize করে না!—আমি যদি পার্তুম তা'হলে কর্তুম। এবার গিয়েই তাঁকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তিনি জীবিত নাই, এতদিন অন্তর্ধান করেছেন।' এই সব কথায় বৃদ্ধের স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল যে তাহা তুমি নিজে না শুনিলে বুঝিবে না। ঐ সুরেই আমি সশ্রদ্ধ প্রীতির মূর্তি দেখিতে পাইলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাঁহার অন্তরটির ছবি। ঠিক ঐ রকম সরল তেজস্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র।···

দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে (বৃদ্ধের চেহারা অন্তরেই দেখিতে পাইবে, আবার অন্তর তাঁহার কথাবার্তাতেই দেখা যায়) সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্যের ভাব আছে। এই-সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।

[১৩০৯]

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

তুমি স্বপ্ন-প্রয়াণের সমালোচনা-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্য-মধুপেরা droneএর জাতি—তাহারা রসও বোঝে না আর ভাল জিনিষের মর্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণটি তাই এ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজে দপ্তরের (waste basket) আবর্জনারাশির মধ্যে মরণাপন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ তাহাকে পোছে না। কোনো কবি গর্ভবাসকালে বিধাতাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর—তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥"

ইহার একটা অনুবাদ—

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে চতুরানন।
লিখোনা লিখোনা শিরে অরসিকে রসনিবেদন।

ব্রহ্মার আশ্বাসবাণী

হইবে তোমার বন্ধু সুরসিক প্রিয়।
কবিত্বরসের ডালি তারে সঁপি দিও॥

প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণটিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ—আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেমন চল্‌চে—চলুক; তুমি যখন আমার মানসপুত্রটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নাবাইবে তখন দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে—এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি—Green-room এ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।

তোমার চিরানুরক্ত শ্রী

ভক্ত দ্বিজ

প্রিয়বন্ধু

প্রিয়নাথ সেন

অভিন্নহৃদয়েষু

রূপকের দুর্বোধ অংশের তাৎপর্য

রূপক		অর্থ	
দাক্ষ্য		কার্য-দক্ষতা	
কল্পনার সখী	সুরুচি	কাব্য-রসাস্বাদন-শক্তি, রসজ্ঞতা	
	শরন্ময়ী	শারদীয় ভাব অর্থাৎ প্রসাদগুণ	
	মাধবী	বাসন্তী ভাব অর্থাৎ মাধুর্যগুণ	
মায়ার সখী	সাত্ত্বিকা	সত্ত্বগুণ	
	রাজসী	রজোগুণ	
	তামসী	তমোগুণ	
মরীচিকা	মায়াবিনী	কুবাসনা (কুবাসনা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতীতি করাইয়া মনকে ভুলায়। মরীচিকা সেইরূপ স্থলকে জলরূপে প্রতীতি করাইয়া পথিককে বিপথে লইয়া যায়। এই মর্মে কুবাসনাকে মরীচিকা উপাধি দেওয়া হইয়াছে।)	
দ্বন্দ্ব		শীতোষ্ণ হর্ষ-শোক প্রভৃতি পরস্পর প্রতি-দ্বন্দ্বি বিঘ্ন-সকলকে তত্ত্ববিদ্‌গণ দ্বন্দ্ব শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন।	
শ্রেয়ঃপথের বিঘ্ন		ছাগ	কাম
		বাঘ	ক্রোধ
		কুক্কুর	লোভ
		অজগর	মোহ
		মহিষ	মদ
		সর্প	মাৎসর্য

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	মুদ্রিত	শুদ্ধ পাঠ
২১	২	পঙ্কজ-আসনে	পঙ্কজ-আসনে—
৯৬	৪	হ'বে রাজা-রাণী,	হ'বে রাজ-রাণী,
১৩৪	২২	নাশায়	নাসায়
১৭৩	৩৫	বন শস্যধন, হর্ম্য	বন, হর্ম্য
১৮১	২৭	সঞ্চয় করিয়া	সঞ্চয় করিতে
১৮৯	৪	sake-নয়,	sake নয়,